বিএনপি সরকারের ১০০ দিন

একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন*

নজরুল ইসলাম

২০২৬

* সমাজ গবেষণা কেন্দ্রের ২০২৬ সালের ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য অনলাইন সেমিনারে (ওয়েবিনারে) উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রবন্ধ।

অধ্যাপক, এশীয় প্রবৃদ্ধি গবেষণা ইন্সটিট্যুট এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণার সাবেক প্রধান।

বিএনপি সরকারের ১০০ দিন:
একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন

নজরুল ইসলাম

ভূমিকা

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি একাই ৪৯.৬ শতাংশ ভোট এবং ২০৯ আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে। দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ায় বিএনপি সংবিধানের সংশোধনী আনারও সামর্থ্য অর্জন করেছে। ফলে বিএনপি শক্তিশালী অবস্থান থেকে সরকার গঠন করেছে। এমতাবস্থায় নিম্নরূপ তিনটি প্রশ্নের উদ্রেক ঘটে: (ক) ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিএনপি কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সেগুলোর শক্তি ও দুর্বলতা কী ছিল? (খ) এসব প্রতিশ্রুতি পূরণে গত প্রায় ১০০ দিনে বিএনপি সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাতে জনগণের প্রত্যাশা কতটুকু পূরিত হয়েছে? (গ) প্রত্যাশা যাতে পূরিত হয় তা নিশ্চিত করায় জনগণের ভূমিকা কী হতে পারে?

এই তিন প্রশ্নের আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে এই আলোচনা যাতে খেই হারিয়ে না ফেলে সেজন্য আলোচনাটি লেখকের ইতিপূর্বে বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত "দশ করণীয়"র কাঠামোতে করা হবে। এই দশ করণীয় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গণবক্তৃতা হিসেবে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে উপস্থাপিত করা হয় (ইসলাম, ২০২৪)[1] এবং পরবর্তীতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাধরিত্রী থেকে *"আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়"* নামে গ্রন্থাকারে এটা প্রকাশিত হয় (ইসলাম ২০২৫ক)। শেষোক্ত প্রকাশনাকেই এই প্রবন্ধে দশ করণীয় সংক্রান্ত মূল রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হবে। দশ করণীয়র তালিকা নিম্নরূপ:

(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস;
(২) সুশাসন অর্জন;
(৩) আনুপাতিক নির্বাচনের প্রবর্তন;
(৪) পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা;
(৫) গ্রাম পরিষদ গঠন;
(৬) আঞ্চলিক বৈষম্য এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ;
(৭) সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি;
(৮) নারী, শিশু, যুব, এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান;
(৯) সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন; এবং
(১০) জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ।

[1] এর আগে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদে এক বক্তৃতাতে এটি পরিবেশিত হয়েছিল।

ক্ষমতায় গেলে কী করবে সে বিষয়ে বিএনপির প্রতিশ্রুতি জানার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো দ্বাদশ (জানুয়ারি ২০২৪) নির্বাচনের আগে উথাপিত বিএনপির ৩১-দফা কর্মসূচি এবং ত্রয়োদশ (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) নির্বাচনের আগে প্রকাশিত বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার "*সবার আগে বাংলাদেশ*" (বিএনপি ২০২৬)। শেষোক্ত দলিলেই বিএনপির প্রতিশ্রুতি সবচেয়ে বিস্তৃত আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং, বর্তমান আলোচনায় বিএনপির প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে এই ইশতেহারই মূল রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটি নিম্নরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত:

(১) রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার;
(২) বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন;
(৩) ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার;
(৪) অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন;
(৫) ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতি।

বিএনপির ইশতেহারে দেওয়া কর্মসূচির শ্রেণীকরণের সাথে দশ করণীয়র সম্ভাব্য অনুরূপতার (*করেসপনডেন্স*) প্রতিষ্ঠা সহজ নয়, কারণ, বিএনপির ইশতেহারের কিছু কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, ইশতেহারটি ব্যাপক এবং তাতে ৩৯টি স্লাইডে বুলেট পয়েন্ট আকারে ৪১৫টি আইটেম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা দেখায় যে, বিএনপি একটি সুবিস্তৃত কর্মসূচি প্রণয়নের চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোথাও কোথাও সূচনামূলক বাক্য ছাড়া প্রস্তাবিত কর্মসূচির পেছনের যুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করা হয় না। দ্বিতীয়ত, কর্মসূচির কার্য-কারণ আলোচনা না করায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির মধ্যে সম্ভাব্য আন্তসম্পর্ক নজরে নেওয়া হয় না। তৃতীয়ত, আন্তসম্পর্ক সম্পর্কে মনোযোগের অবহেলার কারণে এসব কর্মসূচির শ্রেণিকরণে নানা সমস্যা থেকে যায়। ৪১৫টি কর্মসূচি পাঁচটি ভাগে এবং ৩০টি উপভাগে বিভক্ত করা হয়; কিন্তু এই বিভক্তি সবসময় যৌক্তিক বা পরিচ্ছন্ন হয়নি। যেমন "ট্যাক্স কাঠামোকে যৌক্তিক করা"কে "যুব উন্নয়ন" ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; অথবা "পরিবেশ, পানি, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা"কে "টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার অর্জনে"র অংশ করা হয়েছে। যাহোক, বিএনপির ইশতেহারের পাঁচটি ভাগ এবং দশ করণীয়র মধ্যকার অনুরূপতা সম্পর্কে সারণী-১ একটা সাধারণ ধারণা দেয়।

সারণি ১

বিএনপির ইশতেহারের কর্মশ্রেণি	দশ করণীয়
(১) রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার;	(২) সুশাসন অর্জন; (৩) আনুপাতিক নির্বাচনের প্রবর্তন (৫) গ্রাম পরিষদ গঠন
(২) বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন;	(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস (৪) পরিবেশের সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

	(৮) নারী, শিশু, যুব, ও বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ (১০) জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ
(৩) ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার;	(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস
(৪) অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন;	(৬) আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস
(৫) ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতি।	(৭) সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি
	(৯) সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ

বিএনপির ইশতেহারের শ্রেণীকরণের উপর্যুক্ত সমস্যাদির কারণে নীচের আলোচনায় আমরা দশ করণীয়র তালিকা অনুযায়ী অগ্রসর হবো। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা পূর্বোল্লিখিত ৩টি প্রশ্নের আলোচনা করবো। এই আলোচনায় প্রায়শ "দশ করণীয়" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত সারণি এবং চিত্রসমূহের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে; যদিও প্রবন্ধের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার স্বার্থে সেগুলো এখানে পুনরায় প্রদর্শিত হয় নি। উৎসাহীরা যাতে এগুলো সহজেই খুঁজে পান সেজন্য এগুলোর নম্বর অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, বিএনপির কর্মসূচিসমূহ এই দলের ২০১৬ সালের ইশতেহারের কত নম্বর স্লাইড থেকে নেওয়া হয়েছে তা তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে।

১) অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস

১.১ বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি এবং তা প্রশমনের বিভিন্ন উপায়

সুবিদিত যে, বিগত সময়কালে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, আয়-বিতরণের গিনি সূচক ১৯৯১-৯২ সালের ০.৩৮৮ থেকে ২০২২ সালে ০.৫৭০তে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে আয়-বিতরণের পালমা-অনুপাত ১.৬৮ থেকে ৩.২-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ পূর্ব-এশিয়ার অনুকরণীয় দেশসমূহের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য আয়-বৈষম্যের এত বিপুল বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। আয়-বৈষম্যের সুউচ্চ বৃদ্ধি নৈতিকভাবে কাম্য নয়; অভ্যন্তরীণ বাজার বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নয়; রাজনীতির উপর ধনীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে; এবং শেষ পর্যন্ত দেশকে বৈষম্য ফাঁদে নিপতিত করে[2]।

আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহকে মোটাদাগে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো "প্রাথমিক আয়" বিতরণকে আরও সমতাধর্মী করা। দ্বিতীয় হলো, কর এবং অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাথমিক আয়ের পুনঃবিতরণের মাধ্যমে "ব্যয়যোগ্য আয়ে"র বিতরণকে আরও সমতাধর্মী করা। যেসব পদ্ধতিতে

[2] এসব বিষয়ে তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়* (সারণি ১.১, ১.২, ১.৩ এবং চিত্র ১.১, ১.২, ১.৩, ১.৪, এবং ১.৫)।

প্রাথমিক আয় বিতরণকে আরও সমতাধর্মী করা যায় তারমধ্যে রয়েছে, (ক) মজুরি বৃদ্ধি[3]; (খ) শ্রম আয়-বিতরণে বৈষম্য হ্রাস; (গ) শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণ[4]; (ঘ) পুঁজি-আয়ের অধিকতর বিচ্ছুরণ এবং তার জন্য ভূমি ও বর্গা সংস্কার; সমবায়ী মালিকানার সম্প্রসারণ; ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের মুনাফায় শ্রমিকদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বৃদ্ধি, ইত্যাদি সম্পাদন; এবং (ঙ) প্রত্যক্ষ উৎপাদনে সরকারি খাতের সম্প্রসারণ।

প্রাথমিক আয়ের পুনর্বিতরণের মাধ্যমে ব্যয়যোগ্য আয়ের বিতরণকে সমতাধর্মী করার উপায় হচ্ছে কর-অনুদান ব্যবস্থাকে দরিদ্র-অভিমুখী করা। এ বিষয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতি মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিশেষত উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে কর-অনুদানের মাধ্যমে পুনর্বিতরণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা খুবই কম[5]। এক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপের প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে: কর-ব্যবস্থাকে আরও দরিদ্র-অভিমুখী করা, যার জন্য প্রয়োজন রাজস্ব আদায়ে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা বৃদ্ধি; কর হারের প্রগতিশীলকরণ; এবং পরোক্ষ করকে দরিদ্র-বান্ধব করা। একইভাবে অনুদান-ব্যবস্থাকেও আরও দরিদ্র-অভিমুখী হতে হবে।

আরও লক্ষণীয় যে, পুনর্বিতরনের পদ্ধতিসমূহকে মোটা দাগে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। পুনর্বিতরণ প্রত্যক্ষ হয় যখন স্বল্পআয়ীদের নগদ অর্থ (কিংবা দ্রব্য, যেমন খাদ্য) আকারে সহায়তা প্রদান করা হয়। এর ফলে স্বল্পআয়ী পরিবারসমূহ আরও বেশি হারে মৌলিক চাহিদাসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) পূরণ করতে সক্ষম হয়; দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পায়; এবং তার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রণোদনার সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের কিছু সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন, প্রথমত, প্রাপ্ত অর্থ সঠিক লক্ষ্যে ব্যবহৃত হবে কিনা তার নিশ্চয়তা থাকে না। নব্বইয়ের দশকে ব্রাজিলসহ বিভিন্ন দেশে "শর্তাধীন অনুদান" কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এসব কর্মসূচিতে স্বল্পআয়ী পরিবারদের অনুদান পাওয়ার জন্য সন্তানদের টিকা দেওয়া, নিয়মিত স্কুলে পাঠানো, ইত্যাদি শর্ত আরোপ করা হয়। তা সত্ত্বেও এই সমস্যার কিছু রেশ থেকেই যায়। দ্বিতীয়ত, এসব কর্মসূচির ফলে শ্রম-বিমুখীনতা দেখা দিতে পারে। তৃতীয়ত, এর ফলে উপকার-প্রাপ্তরা সমাজের বাকিদের কাছ থেকে একটি পৃথক এবং সামাজিকভাবে হেয় গোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারে, যা সমাজের সংহতির জন্য ক্ষতিকর।

প্রত্যক্ষ পুনর্বিতরণের এসব সম্ভাব্য সমস্যার কারণে অনেকে পরোক্ষ বিতরণের পক্ষপাতী। এ ধরণের বিতরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো প্রগতিশীল হারে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ধনীদের কাছ থেকে অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ দ্বারা সর্বজনীন শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং চালু রাখা। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরাও অন্যদের সাথে একই স্কুলে যেতে পারে এবং স্বাস্থ্য সেবা পেতে পারে। এভাবে এসব পরিবারের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি

---

[3] বিগত দশকগুলিতে বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি মোটেও সন্তোষজনক নয় এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি হারের তুলনায় খুবই পিছিয়ে আছে (*দশ করণীয়,* সারণি ১.৪, চিত্র ১.৬, ১.৭); এবং আন্তর্জাতিক তুলনায়ও বাংলাদেশের এ সংক্রান্ত পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয় (*দশ করণীয়* চিত্র ১.৮, সারণি ১.৫, ১.৬)

[4] দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়* (সারণি ১.৭, চিত্র ১.৯)।

[5] দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়* (চিত্র ১.১০, ১.১১, ১.১২, ১.১৩, ১.১৪, ১.১৫, ১.১৬)।

পায়; কিন্তু তাঁরা সমাজ থেকে পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হয় না। পুনর্বিতরণের বহিঃউৎসারিত (*এক্সটারনালিটি*[6]) ইতিবাচক প্রভাবও প্রত্যক্ষ পদ্ধতির তুলনায় পরোক্ষ পদ্ধতির জন্য বেশি বলে অনেক গবেষণায় দেখা যায়[7]।

সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অর্থনইতিক বৈষম্য হ্রাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন অনেক উন্নত দেশে কর্মে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় সকলের বেতনের একটি অংশ সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলের জন্য কেটে রাখা হয়। এর সাথে যোগ হয় প্রতি কর্মীবাবদ নিয়োগকারীদের প্রদত্ত অংশ। বৃদ্ধকালে সকলে এই নিরাপত্তা তহবিল থেকে আয় অথবা ভাতা পান। এর ফলে সময়ান্তরে আয়ের পুনর্বিতরণ ঘটে। তদুপরি, বৃদ্ধকালে স্বল্পআয়ীরা সাধারণত সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে তাদের প্রদত্ত অর্থের চেয়ে বেশী পান; পক্ষান্তরে, উচ্চআয়ীরা পান কম। ফলে, এই ব্যবস্থার অধীনে উচ্চআয়ীদের কাছ থেকে স্বল্পআয়ীদের নিকট আয়ের পুনর্বিতরণও ঘটে। অর্থাৎ, আয়ের সময়ান্তর এবং উচ্চ থেকে নিম্ন আয়ীদের নিকট, উভয় ধারাতে পুনর্বিতরণ ঘটে। প্রায় সকল উন্নত দেশেই সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা বিরাজ করে এবং তার মাধ্যমে একদিকে সকলের জন্য বৃদ্ধ বয়সে ন্যূনতম আয় নিশ্চিত হয় এবং অন্যদিকে আয়বৈষম্যও হ্রাস পায়। এই পটভূমির আলোকে আমরা অতঃপর আয়বৈষম্য হ্রাস সম্পর্কে বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিসমূহের দিকে নজর দিতে পারি।

১.২ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে বিএনপির প্রতিশ্রুতি

বিএনপির ইশতেহারের "বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন" শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়ে দলের প্রতিশ্রুতিসমূহ উল্লেখিত হবে বলে আশা করা যায়। এই ভাগকে নিম্নরূপ ৮টি উপভাগে ভাগ করা হয়েছে:

২.১ সামাজিক সুরক্ষা [১১]
২.২ নারীর ক্ষমতায়ন [১২]
২.৩ কৃষি ও খাদ্য [১৩]
২.৪ কর্মসংস্থান ও যুব উন্নয়ন [১৪]
২.৫ শিক্ষা, মানবসম্পদ, ও স্বাস্থ্যসেবা [১৫]
২.৬ প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি [১৬]
২.৭ শ্রমিক ও প্রবাসী কল্যাণ [১৭]
২.৮ পরিবেশ, পানি, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা [১৮]

[6] বহিঃউৎসারিত প্রভাব হলো সেই প্রভাব যা একজন ব্যক্তি নিজের হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন না। যেমন একজন মানুষ শিক্ষিত হলে তার আশেপাশের অন্যরাও উপকৃত হন। কিন্তু সেই ব্যক্তি স্বীয় শিক্ষালাভ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এই উপকারকে সাধারণত হিসাবে নেন না।

[7] এসব কারণে দশ করণীয়তে বাংলাদেশের জন্য পুনর্বিতরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ পদ্ধতির ভূমিকা অস্বীকার না করেও পরোক্ষ পদ্ধতির উপর বেশী জোর দেওয়া হয়।

উপ-ভাগের এই তালিকা থেকে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, এখানে আয়বৈষম্য হ্রাসকে একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। দ্বিতীয়ত, আয়বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয় না। তবে স্বচ্ছ কোনো ধারণাকাঠামো দ্বারা পরিচালিত না হলেও বিএনপির ইশতেহারে কিছু বিক্ষিপ্ত কর্মসূচি পাওয়া যায় যেগুলোকে আয় বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত বলে ভাবা যেতে পারে। যেমন, "শ্রমিক ও প্রবাসী কল্যাণ" উপ-বিভাগে [১৭] মজুরির মূল্যস্ফীতিভিত্তিক সূচকায়ন ("প্রাইস-ইনডেক্সভিত্তিক মজুরি"), "গণতান্ত্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ (CBA) করার অধিকার," রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে শ্রমিকদের অবসরকালীন সুবিধা (পেনশন স্কীম), মাতৃকালীন ছুটি, শিল্প চালুকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, ইত্যাদির কথা বলা হয়। এছাড়া প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য কিছু বিশেষায়িত কর্মসূচির কথাও উল্লেখিত হয় [১৭]।

এসব কর্মসূচির মধ্যে মজুরির মূল্যস্ফীতিভিত্তিক সূচকায়ন একটি ভাল প্রস্তাব। ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ করার যথাযথ অধিকারও মজুরি বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হতে পারে। তবে শতশত কর্মসূচির মধ্যে এগুলো যেন হারিয়ে যায় এবং ততটা গুরুত্ব পায় না। তদুপরি, শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিম যদি "রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে" হয় তবে সেটা হবে এক ধরনের পুনর্বিতরণ, শ্রমিকদের প্রাথমিক আয় বৃদ্ধি নয়। একই কথা বলা যেতে পারে "রেশনিং ব্যবস্থা (শিল্প এলাকায় টিসিবি এবং ওএমএস-এর মাধ্যমে সাশ্রয়ী নিত্যপণ্য)" সরবরাহ, "শ্রমঘন এলাকায় বিশেষায়িত হাসপাতাল, ক্লিনিক, ও স্কুল স্থাপন"-এর মতো কর্মসূচি সম্পর্কে।

তবে "সামাজিক সুরক্ষা" উপভাগে কিছু পুনর্বিতরণমূলক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়, যেগুলো ব্যয়যোগ্য আয়ের অসমতা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। যেমন বিশেষ গুরুত্বসহকারে ঘোষণা করা হয় যে, বিএনপি পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি পরিবারকে "ফ্যামিলি কার্ড" দিবে[৪], এবং কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মৎস্যচাষী, ও প্রাণিসম্পদ খামারীদের "কৃষক কার্ড" প্রদান করবে" [১১]। আরও বলা হয় যে, সামাজিক সুরক্ষার আওতা সম্প্রসারণ করা হবে; এবং এতে বিরাজমান অনিয়ম দূর করে স্বচ্ছতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা হবে [১১]।

বিএনপির ইশতেহারের দ্বিতীয় যে স্থানে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টির স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেটা হলো "ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার" শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগ। এই ভাগের উপ-বিভাগসমূহ নিম্নরূপ:

৩.১ অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ন [২০]
৩.২ বিনিয়োগ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানখাতের সংস্কার [২১]
৩.৩ শিল্পখাত ও সৃজনশীল অর্থনীতির উন্নয়ন [২২]
৩.৪ সেবাখাত উন্নয়ন [২৩]
৩.৫ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পরিবহন খাত উন্নয়ন [২৪]
৩.৬ আইসিটি [২৫]
৩.৭ রাজস্ব আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা [২৬]

[৪] এটার নাম "পরিবার কার্ড" হলো না কেন তা বোধগম্য নয়।

কিন্তু এই ভাগেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। কেবল "অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ন" শীর্ষক উপ-বিভাগে "কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া"র কথা বলা হয় [২০], যদিও আমরা জানি যে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আর আয়বৈষম্য হ্রাস সবক্ষেত্রে সমাভিমুখি নাও হতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কিছু কর্মসূচির জন্য (যেমন দারিদ্র্য-পীড়িত ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি [১২], যুবদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি [১৪], ইত্যাদি)। সুতরাং, সাধারণভাবে, বিএনপির ইশতেহারে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়ে কোনো সামগ্রিক বাহ্য এবং জোরালো প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না।

১.৩ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে নবগঠিত বিএনপি সরকারের পদক্ষেপের মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

এটা প্রশংসনীয় যে, গঠিত হওয়ার পর বিএনপি সরকার অত্যন্ত দ্রুত স্বীয় নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তারমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ্য হলো "ফ্যামিলি কার্ড" বিতরণের সূচনা। এই কার্ডধারিরা মাসে ২,৫০০ টাকা পাবেন। ১০ মার্চ প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকার কড়াইল বস্তিতে এই কর্মসূচির সূচনা করেন। ধারণা করা হচ্ছে, দেশের মোট ৪ কোটি পরিবারকে এই কার্ড দেওয়া হবে। আরও বলা হচ্ছে যে, সব পরিবার কার্ড পেলেও, সকলে (অর্থাৎ সঙ্গতিসম্পন্নরা) অনুদান পাবেন না[9]।

দরিদ্রদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে নগদ অনুদান প্রদানের প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই প্রচলিত। উন্নত দেশসমূহে সাধারণত এটা প্রদান করা হয় কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে। যেমন অনেক উন্নত দেশে "অর্জিত আয় ক্রেডিট" নামক কর্মসূচি প্রচলিত আছে, যার অধীনে যেসব পরিবারের শ্রম-আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে তাদের প্রদত্ত কর হয় নেতিবাচক; অর্থাৎ, কর প্রদানের পরিবর্তে তাঁরা বরং কিছু অর্থ পান। এটা করা হয় যাতে শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করা নিরুৎসাহিত না হয়। পূর্বোল্লিখিত "শর্তাধীন অনুদান" কর্মসূচিও নগদ অনুদানের একটি উদাহরণ। বাংলাদেশে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে "বার্ধক্য ভাতা," "বিধবা ভাতা" এবং এ ধরণের অন্যান্য কিছু কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এই সরকার শেষের দিকে একটি সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচিও হাতে নিয়েছিল, যদিও তা নিয়ে নিয়ে নানা প্রশ্ন ছিল এবং ততটা অগ্রসর হতে পারেনি।

ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে স্বল্পআয়ীদের অনুদান প্রদানের যে কর্মসূচি বিএনপি সরকার গ্রহণ করেছে তার ভাল এবং উদ্বেগ, উভয় দিকই আছে। ভাল দিকগুলোর কথা উপরে ইতিমধ্যেই উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া নারীদেরকে প্রাপক করার ফলে পরিবারের মধ্যে এবং সমাজে নারীদের মর্যাদা, ক্ষমতায়ন, ও ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে[10]। (নারীদের প্রতি মনোযোগের বিষয় নিয়ে পরে আমরা আরও আলোচনা করবো।) বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই কার্ডের আরেকটি বিশেষ উপযোগিতা হলো, দেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদের সাথে রাষ্ট্রের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা। উন্নত দেশসমূহে প্রায় সকল নাগরিক রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পর্কাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের

[9] দ্রষ্টব্য *প্রথম আলো*, ১১ মার্চ ২০২৬।

[10] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: সেলিম রায়হান, "ফ্যামিলি কার্ড: নকশাগত দুর্বলতা কাটানোর পরীক্ষা," *প্রথম আলো*, ১০ মার্চ, ২০২৬।

পরিবারদের মাত্র আনুমানিক ১ শতাংশ কর দাখিল করেন[11]। অর্থাৎ, প্রায় ৯৯ শতাংশ পরিবার প্রত্যক্ষ করব্যবস্থার বাইরে। স্বল্পআয়ীদের জন্য এই অনুপাত প্রায় ১০০ শতাংশ। রাষ্ট্রের সাথে তাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। ফ্যামিলি কার্ড এই সম্পর্ক স্থাপন করবে। আপাতত এই সম্পর্ক একপক্ষীয়। তবে সে কারণে এই সম্পর্ক স্বল্পআয়ীদের আরও আকর্ষণীয় বোধ হতে পারে। এই কার্ড পাওয়ার অনুষ্ঠানে সমবেত কড়াইল বস্তির নারীদের চোখেমুখে তারই প্রতিফলন দেখা গিয়েছে।

তবে পাশাপাশি উদ্বেগের দিকগুলোও মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমটি হলো অর্থসংস্থানের প্রশ্ন। পুনর্বিতরণের মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাসের প্রয়াসের দুটি দিক থাকে: কর এবং অনুদান। বিএনপির উপর্যুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা পদক্ষেপসমূহে কেবল অনুদানের চিন্তাই লক্ষ করা যায়, করের দিকটির বিষয়ে মনোযোগ দেখা যায় না। ফলে এসব কর্মসূচি ভারসাম্যহীন হওয়ার বিপদ রয়ে যায়। যেমন, কিছু গবেষকের মতে, পুরোদস্তুর চালু হলে, ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির জন্য বছরে ব্যয় হবে প্রায় ৬০,০০০ কোটি টাকা[12]। লক্ষণীয়, ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে মোট উন্নয়ন ব্যয় ছিল ২,৩৮,০০০ কোটি টাকা[13]। সুতরাং, ফ্যামিলি কার্ড বাবদ ব্যয় হবে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৫.২ শতাংশ)। অন্যান্য প্রস্তাবিত কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত অনুদান যোগ হলে এই অনুপাত আরও বৃদ্ধি পাবে। এত বিরাট পরিমাণ অর্থ অনুদানে ব্যয় হলে দেশের উন্নয়ন বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্থ হবে কিনা তা একটি বিবেচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় উদ্বেগ হলো, যার কথা উপরে উল্লেখিত হয়েছে, এসব অনুদানের ফলে শ্রম দ্বারা উপার্জনের প্রণোদনা হ্রাস এবং এক ধরণের অবাঞ্ছনীয় সরকার-নির্ভরতার উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা। উন্নত দেশসমূহে এ ধরণের সমস্যা লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশেও যাতে এ ধরণের সমস্যা দেখা না হয়, সে বিষয়ে প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া ভাল হবে। তৃতীয়ত, যেমনটা উপরে উল্লেখিত হয়েছে, এ ধরণের প্রত্যক্ষ অনুদান এক পর্যায়ে একটা অসম্মানের বিষয়ে হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়েও সতর্ক হওয়া ভাল। চতুর্থত, পরোক্ষ পদ্ধতির অনুদানের সাথে তুলনা না করে প্রত্যক্ষ পদ্ধতির অনুদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তা সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে। সেটাও চিন্তার মধ্যে থাকা দরকার।

ফ্যামিলি কার্ড ছাড়া নবগঠিত বিএনপি সরকার আরেকটি যে কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছে তা হলো কৃষকদের ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা এবং "কৃষক কার্ড" বিতরণ যার মাধ্যমে কৃষকের বিভিন্ন সেবা পাবেন। দরিদ্র কৃষকেরা এটা পেলে তা বৈষম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উপকারী হবে।

সুতরাং, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়ে বিএনপির ইশতেহার এবং এযাবত নেওয়া পদক্ষেপের আলোকে আমরা নিম্নরূপ তিনটি উপসংহারে উপনীত হতে পারি।

[11] মোট পরিবারের সংখ্যা ৪ আনুমানিক কোটি এবং কর দাখিলকারির সংখ্যা আনুমানিক ৪৫ লক্ষ।

[12] সেলিম রায়হান, পূর্বোক্ত।

[13] বাজেট অনুযায়ী পরিচালন এবং উন্নয়ন উভয় মিলে মোট ব্যয় ৭,৯০,০০০ কোটি টাকা, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা ।

প্রথমত, "বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন"র কথা বলা হলেও বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে গিনি-সহগ, পালমা-অনুপাত, ইত্যাদি সূচকভিত্তিক কোনো সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়নি এবং প্রাথমিক কিংবা ব্যয়যোগ্য আয় বিতরণের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচিকে এ ধরণের সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অংশ হিসেবে সংগ্রন্থিত করা হয় নি।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক আয় বিতরণকে সমতাধর্মী করার চেয়ে পুনর্বিতরণের মাধ্যমে ব্যয়যোগ্য আয় বিতরণকে সমতাধর্মী করার প্রতিই বেশী আগ্রহ দেখা যায়। তবে বিএনপি এসব পুনর্বিতরণের কর্মসূচিকে মূলত সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধির কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করে, আয় বৈষম্য হ্রাসের জন্য নয়। তবে এসব কর্মসূচির ভাল দিকের পাশাপাশি কিছু উদ্বেগের দিকও আছে, যেগুলির প্রতি ততোটা সচেতনতা কিংবা মনোযোগ লক্ষ করা যায় না। তদুপরি, অনুদানের যে দুই পদ্ধতি হতে পারে – তথা "প্রত্যক্ষ" এবং "পরোক্ষ" – তার কোন প্রতিফলন এবং বাংলাদেশের জন্য এগুলোর আপেক্ষিক উপযোগিতার বিবেচনা দেখা যায় না।

তৃতীয়ত, ইশতেহারে প্রাথমিক আয়-বিতরণ সংক্রান্ত কয়েকটি ভাল প্রস্তাব আছে, যেমন মজুরিকে (২ বছর পরপর) মূল্যস্ফীতি সূচকাবদ্ধ করা এবং শ্রমিকদের "গণতান্ত্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ (CBA) করার অধিকার" প্রদান। তবে এগুলো তেমন গুরুত্ব পায় নি এবং কতটুকু বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। বরং, শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বেশিরভাগ প্রস্তাব বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের উপর সঁপে দেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে এগুলোও বহুলাংশে পুনর্বিতরণমূলক কর্মসূচি হিসেবে থেকে যায়, প্রাথমিক আয়ের শ্রমের হিস্যাবৃদ্ধিমূলক নয়।

চতুর্থত, বিএনপি সরকার "গণতান্ত্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ (CBA) করার অধিকার" প্রদান সম্পর্কে কতখানি আন্তরিক, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, গত ১২ এপ্রিল বিএনপি সরকার সংসদে "বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল (২০২৬)" পাশ করে। এটি ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক জারিকৃত শ্রম আইন (সংশোধন)-র সংশোধিত রূপ। পাশকৃত আইন সম্পর্কে *বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস)* নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম আইন অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে মালিকপক্ষের যেসব আপত্তি ছিল, সেগুলো সবই বিএনপি সরকার এই আইন সংশোধন করতে যেয়ে গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে শ্রমিক সংগঠনসমূহ যেসব আপত্তি করেছিল সেগুলো আমলে নেওয়া হয় নি"[14]। সুতরাং, এই আইন দেখায় যে, ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও "ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ (CBA) করার অধিকার" প্রদান এবং মুদ্রস্ফীতির হারের সাথে শ্রমিকদের মজুরিকে সূচকাবদ্ধ করার বিষয়ে বিএনপি কতটা আন্তরিক হবে তা বলা কঠিন।

২) সুশাসন অর্জন

২.১ সুশাসনের আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা-কাঠামো

[14] দ্রষ্টব্য: https://citizensvoicebd.com/court-of-law/105477/

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর "রাষ্ট্র সংস্কারে"র ইস্যুটি সামনে চলে আসে। "রাষ্ট্র সংস্কার" কথাটি কিছুটা বিমূর্ত ধরনের। সহজ ভাষায় এর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন এবং তা সুগম করার জন্য বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, ইত্যাদি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংস্কারের শিরোনামে এই আলোচনাটি বাংলাদেশ সাম্প্রতিক হলেও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক আলোচনায় এটি একটি পুরানো ইস্যু এবং তা "গভার্ন্যান্স" শিরোনামে আলোচিত হয়েছে। বাংলায় "গুড গভার্ন্যান্স"কে "সুশাসন" বলা হয়, এবং সে অনুযায়ী "ব্যাড গভার্ন্যান্স"কে "কুশাসন" কিংবা "অপশাসন" বলা যেতে পারে। কিন্তু "গভার্ন্যান্স" শব্দটির ভাল বাংলা চোখে পড়ে না। এমতাবস্থায় আমি এটাকে "পরিশাসন" বলার প্রস্তাব করেছি[15]।

ঘনিষ্ট বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরিশাসনের দুটি দিক আছে। একটি রাজনৈতিক এবং অন্যটি প্রশাসনিক[16]। এই দুই দিক পরস্পরকে প্রভাবিত করে। ফলে শুভ এবং অশুভ দুই ধরনের চক্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে। "অশুভ পরিশাসন চক্রে"র উদ্ভব ঘটে যখন অসন্তোষজনক রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রশাসনের মানের অবনতি ডেকে আনে, এবং নিম্নমানের প্রশাসন রাজনীতির মানের আরও অবনতি ঘটায়। এর বিপরীত হলো "শুভ পরিশাসন চক্র," যখন ভাল মানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে একটি নিম্নমানের প্রশাসনকেও উন্নত করে, এবং তখন সেই উন্নত প্রশাসন রাজনীতির আরও মানোন্নয়নে সহায়ক হয়[17]।

লক্ষণীয়, যদিও পরিশাসনে রাজনীতি ও প্রশাসন একে অপরকে প্রভাবিত করে, তবে এই দুইয়ের মধ্যে মূল ভূমিকা পালন করে রাজনীতি। রাজনীতি উন্নত মানের হলে নিম্নমানের প্রশাসনকেও উন্নত করার সম্ভব। পক্ষান্তরে, রাজনীতি নিম্নমানের হলে ভালমানের প্রশাসনও ক্রমশ অধোগতি সম্মুখীন হয়। এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশে "অশুভ পরিশাসন চক্রে"র উদ্ভব ঘটেছে এবং তার একটি ফলশ্রুতি হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির "নিঃসরণ মডেল"। এই মডেলের অধীনে সরকারি বাজেট এবং দেশের অর্থায়ন খাত (ব্যাংকিং, ইনশিউরেন্স, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি) থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ অবৈধ এবং অনৈতিক উপায়ে ব্যক্তিখাতে নিঃসরিত হয়, এবং তার একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়[18]। একবার এই মডেল কায়েম হওয়ার পর তা "অশুভ পরিশাসন চক্র"কে জায়মান থাকতে সহায়তা করে। বাংলাদেশে রাষ্ট্রসংস্কার বলতে মূলত "অশুভ পরিশাসন চক্র" থেকে "শুভ পরিশাসন চক্র" উত্তরণের আকাঙ্ক্ষাকেই বোঝায়।

২.২ রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে বিএনপি'র প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি – ৩১ দফা

রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়ে নবগঠিত বিএনপি সরকারের অবস্থান এবং পদক্ষেপসমূহ বোঝার জন্য এর পেছনের ইতিহাসটি স্মরণ করা দরকার। সুশাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের আলোচনা নব্বইয়ের দশক থেকেই শুরু

[15] দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়,* পরিচ্ছেদ ২।

[16] দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়,* চিত্র ২.১।

[17] দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়,* চিত্র ২.২ক, ২.২খ।

[18] দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়,* চিত্র ২.৪।

হয়[19]। পরবর্তীতে আরও অনেকে এ আলোচনায় যোগ দেন এবং রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিতে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও আন্দোলন গড়ে তোলেন। বিএনপিও রাষ্ট্র-সংস্কারের দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি প্রথমে ১০ দফা নিয়ে অগ্রসর হলেও পরবর্তীতে "গণতন্ত্র মঞ্চ" কর্তৃক প্রণীত "রাষ্ট্র মেরামতে"র ২৭ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তারসাথে ৪ দফা যোগ করে ৩১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে[20] এই কর্মসূচিতে যেসব রাজনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাবের কথা অন্তর্ভুক্ত হয়, তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ:

২) নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন;
৩) ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান;
৪) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বকাল দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা;
৫) সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন;
৬) সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল;
৭) স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন;
৮) সুষ্ঠু সাংবিধানিক কমিশন গঠন; এবং
৯) জুডিশিয়াল কমিশন (বিচারপতি নিয়োগ আইন) প্রণয়ন।

সুবিদিত, বিএনপি শেষাবধি দ্বাদশ নির্বাচন করে না এবং আওয়ামী লীগের একক দলীয় সরকার গঠিত হয়। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে এবং ৮ই আগস্ট ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়।

২.৩ অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক পরিচালিত সংস্কার প্রক্রিয়ায় বিএনপির অংশগ্রহণ এবং তার ফলশ্রুতি

অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে প্রথমে ১১টি সংস্কার কমিশন এবং পরে এসব কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ঐকমত্য অর্জনের জন্য একটি "ঐকমত্য কমিশন" গঠন করে। এই কমিশন প্রথমে রাজনৈতিক দলসমূহ অথবা তাদের জোটের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করে এবং এক পর্যায়ে সকল রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে একত্রে উন্মুক্ত (টেলিভিশনে সম্প্রচারের মাধ্যমে) আলোচনায় নিয়োজিত হয়[21]। এই আলোচনায় বহু বিষয়ে ঐকমত্য অর্জিত হলেও অনেক বিষয়ে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় কমিশন "ভিন্নমত-সহযোগে-ঐকমত্য" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ঘোষণা দেয় এবং তার ভিত্তিতে "জুলাই সনদ" প্রণয়ন করে[22]।

---

[19] এ বিষয়ে শুরুর দিকে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (1998, 1999a, 1999b, 2001, ২০০৮), ইসলাম (২০১১)। এসব বিষয়ে বিস্তৃত ও সংগ্রন্থিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam (2016) এবং ইসলাম (২০২৫)

[20] দ্রষ্টব্য *বাংলাদেশের রাজনীতি – সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ইসলাম ২০২৫, পৃ ১৪০-১৪২)

[21] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য নজরুল ইসলাম, "কোন পথে সংস্কার ও রাজনৈতিক ঐকমত্য," *প্রথম আলো* ২১ মে, ২০২৫ এবং "আবারও কি সংস্কারের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে," *প্রথম আলো,* ২ জুলাই, ২০২৫।

[22] বলাবাহুল্য, "ভিন্নমত-সহ-ঐকমত্য" একটি "সোনার-পাথর-বাটি" (অক্সিমোরন)'র মতো, যেটা হওয়ার নয়। পরবর্তী ঘটনাবলী তাই প্রমাণ করে। পূর্ণাঙ্গ "জুলাই সনদে"র জন্য দেখুন

ভিন্নমত প্রকাশকারী দলসমূহের অন্যতম হলো বিএনপি। জুলাই সনদে মোট ৮৪টি "দফা" (বিষয়) অন্তর্ভুক্ত হয়। তারমধ্যে ২৯টি দফা সম্পর্কে বিএনপির ভিন্নমত সংযোজিত হয়[23]। তবে এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর বিষয়ে বিএনপি নীতিগতভাবে একমত হয়, কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে আইন কিংবা বিধিমালা প্রণয়নকেই যথেষ্ট মনে করে। বিএনপির এসব ভিন্নমত ২০২৪ সালের ৩১-দফা দাবিনামা থেকেই বহুলাংশে নিঃসৃত হয়। যেসব দফা সম্পর্কে বিএনপি নীতিগত ভিন্নমত প্রকাশ করে সেগুলো কোনটি এবং সেগুলো সম্পর্কে বিএনপি কী মত পোষণ করে তা নিম্নরূপ [তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত]:

(৩) *উচ্চকক্ষের ক্ষমতা সংক্রান্ত*
[বিএনপির মতে, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কোন এখতিয়ার উচ্চকক্ষের থাকবে না।]

(১১) *রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব*
[বিএনপির মতে, বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর এবং বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে রাষ্টপতি নিজ এখতিয়ারবলে নিয়োগ দিতে পারবেন না]

(১৫) *প্রধানমন্ত্রীর একাধিক পদের থাকার বিধান*
[বিএনপির মতে, প্রধানমন্ত্রী একই সাথে দলীয় প্রধান থাকতে পারবেন।]

(১৬) *তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা*
[বিএনপির মতে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্বাচনের বিষয়ে সংকট দেখা দিলে তা জাতীয় সংসদে নিরসিত হবে।]

(১৮) *উচ্চকক্ষের গঠন*
[বিএনপির মতে, নিম্নকক্ষের আসনের সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। তদুপরি বিএনপি একমত নয় যে, "রাজনৈতিক দলসমূহ নিম্নকক্ষের সাধারণ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সময় একই সঙ্গে উচ্চকক্ষের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে। তালিকায় কমপক্ষে ১০ (দশ) শতাংশ নারী প্রার্থী থাকতে হবে"]।

(১৯) *উচ্চকক্ষের দায়িত্ব ও ভূমিকা*
[বিএনপি একমত নয় যে, (ক) উচ্চকক্ষ "নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না; তবে কোনো জাতীয় গুরুতকপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাশকৃত অর্থবিল ও আস্থাভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হতে হবে। এবং (ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়

---

https://content.thedailycampus.com/assets/file_manager/source/Abc/Final%20July%20Chater%2016%20October%202025.pdf

[23] এগুলো হলো: ৩, ১১, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২৫, ২৬, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৩, ৬০, ৬৬, ৭৩, ৭৯, ৮০, ৮৪।

পাস করতে হবে। অর্থাৎ, বিএনপির মতে, সংবিধান সংশোধন, অর্থ বিল, আস্থা ভোট, এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি) ইত্যাদি বিল উচ্চকক্ষে প্রেরণ করা হবে না।]

(২৫) *জাতীয় সংসদে দলে বিরুদ্ধে ভোটদান*

[বিএনপির মতে, "জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কেবল অর্থবিল এবং আস্থা ভোট প্রদনের ক্ষেত্রে নিজ দলের প্রতি অনুগত থাকবেন। অন্য যেকোনো বিষয়ে তাঁরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন"। এর সাথে বিএনপি যোগ করতে চায় যে, "কোন রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের রাজনৈতিক ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তাঁরা 'সংবিধান সংশোধন' ও 'জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি') বিষয়গুলোও সংযুক্ত করতে পারবে"।]

(২৬) *আন্তর্জাতিক চুক্তি আইনসভায় অনুমোদন*

[বিএনপি একমত নয় যে, " সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, জাতীয় স্বার্থ বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রভাবিত করে এরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের পর আইনসভার উভয় কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের অনুমোদন (র‍্যাটিফাই) করা হবে"।]

(৩১) *সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ*

[বিএনপি একমত নয় যে, "সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগীয় নিয়োগ কমিশন (Judicial Appointment Commission (JAC)) গঠন করা হবে"। বিএনপির মতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই; উপযোগী আইন প্রণয়নই যথেষ্ট হবে।]

(৩২) *সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধান*

[বিএনপি একমত নয় যে, "সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগ কমিশন সংক্রান্ত বিধানকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে"। বিএনপির মতে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নেই; বরং উপযোগী আইন প্রণয়নই যথেষ্ট হবে।]

(৩৩) *বিচার বিভাগের স্বাধীনতা*

[বিএনপি একমত নয় যে, "সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হবে"। বিএনপির মতে সংবিধানের ৯৪(৪) এবং ১১৬(ক) ধারায় এ বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় এর পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজনে নেই।

(৩৪) *সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ*

[বিএনপি একমত নয় যে, "রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে, যে সার্কিট বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন তার পরিবর্তে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রতীতি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করা হবে"। বিএনপির মতে "এ বিষয়ে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে"।]

(৩৭) *স্থায়ী সরকারি এটর্নী সার্ভিস গঠন*

[বিএনপি একমত নয় যে, সংবিধানে এরূপ যুক্ত করা হবে যে, সংবিধানের অধীনে সুপ্রিম কর্মরত ো জেলা ইউনিটের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী সরকারি এটর্নী সার্ভিস গঠন করা হবে। বিএনপির মতে "সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়ঙ্করা যেতে পারে"।

(৩৯) *ন্যায়পাল নিয়োগ*
[বিএনপি শুধু (ক) ও (ঘ)'র সাথে একমত। (খ), (গ), এবং (ঙ)'র সাথে একমত নয়।]

(৪০) *সরকারি কর্ম কমিশন গঠন*
[বিএনপির মতে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে এ বিষয়ে উপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে।]

(৪১) *মহা হিসাবরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ*
[বিএনপির মতে, এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে উপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে।]

(৪২) *দুর্নীতি কমিশন নিয়োগ*
[বিএনপির মতে, এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে উপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে।]

(৪৪) *স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন*
[বিএনপির মতে, এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে উপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে।]

(৪৫) *স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা*
[বিএনপির মতে, এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে উপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে। "জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচির অংশ না হলে, স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়নমূলক কাজের উপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সমূর্ণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব থাকবে" – এ বিষয়েও বিএনপির ভিন্নমত রয়েছে, যদি তা বিধৃত হয় নি।]

(৪৬) *সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে ন্যস্ত করা*
[বিএনপির মতে, এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে উপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে।]

(৪৭) *স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ*
[বিএনপির মতে, এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সংবিধান সংশোধনের পরিবর্তে উপযোগী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে করা যেতে পারে এবং বাজেট বরাদ্দের উচ্চকক্ষের কোনো ভূমিকা নেই।]

(৫৩) *স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন*

[বিএনপির মতে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তাঁরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারবে।]

(৬০) *আইনজীবী সমিতি ও বার কাউন্সিল নির্বাচন*

[বিএনপির মতে, "কোন নাগরিকের রাজনীতি চর্চার সংবিধানিক অধিকার খর্ব করা যাবে না"। তবে, কোন রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তাঁরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারবে।]

(৬৬) *তিনটি (সাধারণ, শিক্ষা, চিকিৎসা) সরকারি কর্ম কমিশন গঠন*

[এ বিষয়ে বিএনপি একমত নয়। তবে মনে করে যে, কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তাঁরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারবে।]

(৭৩) নির্বাচনী অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করা

[বিএনপির মতে, "প্রার্থীর আয়কর রিটার্ন একটি প্রাইভেট ডকুমেন্ট। দুর্নীতি দমন কমিশন অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ আদালতের মাধ্যমে উহা তলব করতে পারবে"। বিএনপি মনে করে যে, কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তাঁরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারবে।]

(৭৯) *আয়কর আইন ২০২৩-এর ৩০৯ ধারার সংশোধন*

[বিএনপি মনে করে না যে, এরূপ সংশোধন "দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে যে, দুদিক কর্তৃক চাহিত কোনো তথ্যাদি বাঁ দলিলাদির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না। বরং, বিএনপির মতে, "আদালতের অনুমোদনক্রমে দুদক যেকোনো তথ্য বা দলিলাদি তলব করতে পারবে"।]

(৮০) *বেসরকারি দুর্নীতিকে শাস্তির আওতায় আনা*

[বিএনপি United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর ২১ অনুচ্ছেদ অনুসারে বেসরকারি খাতের দুর্নীতিকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্ত্র আওতায় আনার বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত, তবে মনে করে যে, এরূপ অপরাধ সাধারণ আইনে বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিএনপি যোগ করে যে, কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তাঁরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারবে।]

(৮৪) Open Government Partnership-এর পক্ষভুক্ত হওয়া

[বিএনপি মনে করে না যে, বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয়ভাবে Open Government Partnership-এর পক্ষভুক্ত হতে হবে। বরং, বিএনপির মতে এটা "জাতীয় সংসদের অনুমোদনসাপেক্ষ" হয়তে হবে। তবে, বিএনপি যোগ করে যে, কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে তাহলে তাঁরা সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পারবে।]

ভিন্নমতসহ জুলাই সনদ প্রণয়ন পর্যন্ত ঐকমত্য কমিশনের কর্মধারা পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ছিল, এবং সে কারণে বিএনপিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই সনদে স্বাক্ষর করে। তবে সিপিবি, বাসদ, বাসদ (মার্কসবাদী), এবং বাংলাদেশ জাসদ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেও জুলাই সনদ স্বাক্ষর করে না, কারণ তাঁদের মতে এই সনদ হলো সংবিধানের মূলনীতিসমূহ পরিবর্তন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উপেক্ষা করার একটি প্রয়াস। লক্ষণীয়, এনসিপিও প্রথমে জুলাই সনদ স্বাক্ষর করে না, তবে তাদের কারণাটা ছিল বিপরীত। তারা জানায় যে, এই সনদ বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক আদেশ কিংবা রূপরেখা ছাড়া এটা স্বাক্ষর করা জনগণের সাথে প্রতারণার শামিল হবে।

যাহোক, এরপর থেকেই অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালিত সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। সেটা ঘটে যখন অন্তর্বর্তী সরকার ২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর "জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫" জারী করে[24]। এই আদেশে জুলাই সনদ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তার রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এই রূপরেখা অনুযায়ী, জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত সংবিধান সংস্কার বিষয়ক ধারাসমূহের উপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রশ্নটি হবে নিম্নরূপ:

> "আপনি কি জুলাই সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং জুলাই জাতীয় সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?" (হ্যাঁ/না):
>
> (ক) নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।
>
> (খ) আগামী জাতীয় সংসদ হইবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ কক্ষ গঠিত হইবে এবং সংবিধান সংশোধনী করিতে হইলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদন দরকার হইবে।
>
> (গ) সংসদে নারী প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধী দল হইতে ডেপুটি স্পীকার ও কয়েকটি সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিতকরণ, রাষ্টপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে ৩০টি প্রস্তাবে জুলাই সনদের রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হইয়াছে -- সেগুলো বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দলগুলো বাধ্য থাকিবে।
>
> (ঘ) জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে।

[24] জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের পূর্ণ বিবরণীর জন্য দেখুন
https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/59217_55912.pdf

এই আদেশে গণভোটের ফলাফল কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে বলা হয় যে, গণভোটের সাথে যে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তাতে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে একটি "সংবিধান সংস্কার পরিষদ" গঠিত হবে এবং এই পরিষদ ১৮০ কার্যদিবসের মধ্যে "জুলাই সনদ এবং গণভোটের ফলাফল অনুসারে সংবিধান সংস্কার সম্পন্ন করিবে"। এতে আরও বলা হয় যে, এই পরিষদে সংবিধান সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব "পরিষদের মোট সদস্যেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে; এবং অন্যান্য বিষয়ে উপস্থিত ও ভোটদানকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিষদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে"। সংবিধান সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে "নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation – PR) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের একটি উচ্চ-কক্ষ গঠন করা হইবে এবং উহার কর্ম-পরিধি নির্ধারণ করা হইবে"[25]।

উপরে আমরা দেখেছি, জুলাই সনদের ৮৪ দফার মধ্যে ২৯টিতে বিএনপি'র ভিন্নমত থাকলেও মূল ভিন্নতা ছিল নিম্নরূপ দুটি প্রশ্নে: (১) সংসদের উচ্চকক্ষের গঠন পদ্ধতি এবং এর এখতিয়ার; এবং (২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গঠন। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশে গণভোটের জন্য ব্যবহৃতব্য প্রশ্নে ভিন্নমত-সম্পন্ন বিষয়সমূহকে ঐকমত্য-সম্পন্ন বিষয়সমূহের সাথে ব্র্যাকেটবন্দী করা হয়, যার ফলে ভোটারদের এসব বিষয়ে আলাদা করে মতামত প্রদানের সুযোগ থাকে না। গণভোট সাধারণত সরলভাবে রচিত একটি প্রশ্ন অথবা প্রস্তাবনার উপর অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে, এই আদেশে গণভোটের জন্য উপস্থাপিত প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে বহু প্রস্তাবনা (বলা যেতে পারে, "একের ভেতর চার")। ধারণা করা অমূলক নয় যে, এই আদেশের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের একটি কৌশল লুক্কায়িত ছিল। সেটি হলো, সংস্কারের পক্ষে সাধারণভাবে যে জনমত, তা ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রশ্নে বিএনপির ভিন্নমতকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে, গণভোটে "হ্যাঁ" বিজয়ী হলে বিএনপি যেসব সংস্কার সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেছে, সেগুলোও মেনে নেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে যাবে। অর্থাৎ, বলা যেতে পারে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিএনপির মতের বিরুদ্ধে কতগুলো সংস্কার প্রস্তাব তার উপর চাপিয়ে দেওয়া[26]।

অন্তর্বর্তী সরকারের এই কৌশলের প্রেক্ষিতে বিএনপিও একটি কৌশল অবলম্বন করে। তাঁরা সরাসরি জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ প্রত্যাখ্যান না করে দ্রুত সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগাদা দেয়। বিএনপি সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি প্রত্যাখান করে; তবে শেষ পর্যন্ত আপস হিসেবে একই দিনে গণভোট ও সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি মেনে নেয়। এই নির্বাচনে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে যাওয়ার ফলে বিএনপির কৌশল জিতে যায়, কারণ সে এখন একক শক্তিতে শুধু যে সরকার গঠন করতে পারে তাই নয়, সংবিধান সংশোধনও করতে পারে। ফলে, যেসব সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে বিএনপি জুলাই সনদে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছিল, সেগুলো তার উপর চাপিয়ে দেওয়ার আর সুযোগ থাকে না।

---

[25] লক্ষণীয়, এখানে অনেকটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, গণভোটে "নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation – PR) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদের একটি উচ্চ-কক্ষ গঠন করা"র প্রস্তাব অনুমোদিত হবে।

[26] লক্ষণীয়, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া এখানে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তা না হলে সংবিধান সংস্কারের জন্য বিএনপিকে বিরোধী দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হতো।

২.৪ রাজনৈতিক সংস্কার প্রশ্নে বিএনপি সরকারের প্রতিশ্রুতি

উপরের আলোচনার আলোকে আশ্চর্য্যের নয় যে, নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভের পর বিএনপি গণভোটসঞ্জাত প্রক্রিয়া প্রত্যাখ্যান করেছে। গণভোটের ফলাফল প্রত্যাখান না করলেও গণভোটসৃষ্ট "সংবিধান সংস্কার পরিষদে"র সদস্য হিসেবে বিএনপির সাংসদরা শপথ গ্রহণ করেনি[27]। বিএনপি নির্বাচনকে কেবল সংসদ গঠনের নির্বাচন হিসেবেই গ্রহণ করে অগ্রসর হয়েছে এবং জনগণও মোটামুটি তা মেনে নিয়েছে বলে মনে হয়।

এই পটভূমিতেই অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বিএনপি সরকার সচেষ্ট হয়। সুবিদিত যে, অন্তর্বর্তী সরকার ১৮ মাসে মোট ১৩৩টি (মোটামুটিভাবে, প্রতি চার দিনে একটি) অধ্যাদেশ জারি করেছিল। নব-নির্বাচিত সংসদ এগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেছিল। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংসদ ১১৩টি অধ্যাদেশ অনুমোদন করেছে। অবশিষ্ট ২০টি অধ্যাদেশের মধ্যে তিনটি রহিত, একটি রহিত এবং পুনঃপ্রচলন করেছে, এবং ১৬টি পুনর্যাচাই এবং উৎকর্ষসাধনপূর্বক পরে নতুন বিল আকারে উত্থাপনের জন্য রেখে দিয়েছে। শেষোক্ত অধ্যাদেশসমূহ প্রায় সবই প্রশাসন সংক্রান্ত। সেজন্য এগুলোর আলোচনা আমরা পরের অনুচ্ছেদে করব।

এখন প্রশ্ন হলো, গণভোটের বাধ্যবাধকতা এড়াতে সক্ষম হলেও বিএনপি নিজে থেকে কী কী রাজনৈতিক সংস্কার করছে কিংবা করবে? এক অর্থে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা উপরে পেয়েছি যেখানে আমরা দেখেছি জুলাই সনদের ২৯টি দফা সম্পর্কে বিএনপির ভিন্নমত কী। তবে এই প্রশ্নের আরও সরাসরি উত্তরের জন্য আমরা বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের দিকেও নজর দিতে পারি। সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে তাতে যেসব প্রতিশ্রুতি (মোট ৩৬টি) সংকলিত হয়, তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলি নিম্নরূপ [৬]।

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা
- উপরাষ্ট্রপতি পদ সৃজন
- প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ১০ বছর
- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- সংসদে উচ্চকক্ষের প্রবর্তন
- বিরোধীদলীয় ডেপুটি স্পীকার
- ৭০নং অনুচ্ছেদ
- স্বাধীন নির্বাচন কমিশন
- সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সংস্কার
- জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

[27] লক্ষণীয় গণভোট গণনা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা পরিদৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু বিএনপি এটাকে কোন ইস্যু করেনি, সম্ভবত এই কারণে যে, এর মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনও প্রশ্নবিদ্ধ হোক সেটা নিশ্চয়ই বিএনপি চায় না।

- প্রধান বিচারপতি প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, যার
- শক্তিশালী সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল
- জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটির সভাপতি পদ সংসদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নিয়োগ
- স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন

এসব বেশিরভাগ সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি[28]। সুতরাং, এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে লক্ষ করা যেতে পারে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আগেও ছিল, কিন্তু তা বাংলাদেশে গণতন্ত্র বজায় রাখতে রাখতে পারেনি। "উপরাষ্ট্রপতি পদ সৃজন," "বিরোধীদলী ডেপুটি স্পীকার নিয়োগ," এবং "জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটির সভাপতি পদ সংসদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যানুপাতে বিরোধীদলের মধ্য থেকে নিয়োগ," ইত্যাদি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মানোন্নয়নের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এই তিনটির প্রথমটি আগেও ছিল, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বহুলাংশে প্রসাধনিক চরিত্রের হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলাদেশের নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দেশে ৭০নং অনুচ্ছেদ (*ফ্লোর ক্রসিং*)-র প্রবর্তন কাঙ্ক্ষিত ফল দিবে কিনা তাও অনিশ্চিত। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতাকেও অকার্যকর করে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, শক্তিশালী জুডিশিয়াল কমিশন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সংস্কার, স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্ত্বশাসন, ইত্যাদি নিঃসন্দেহে কাম্য; কিন্তু প্রশ্ন হলো কীভাবে এগুলো অর্জিত হবে। এসব বিষয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিএনপির কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এখনো আসেনি। সবশেষে, উচ্চকক্ষের কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে এর গঠনের উপর। নিম্নকক্ষের আসন অনুপাতে গঠিত হলে উচ্চকক্ষ নেহাত নিম্নকক্ষের একটি প্রতিবিম্ব হবে এবং তা প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারবে না। (এ বিষয়ে "আনুপাতিক নির্বাচন" শীর্ষক পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা আরও আলোচনা করব।)

সুতরাং, সংবিধান সংস্কারে সম্পূর্ণ খোলা হাত পেয়েও যে বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে পারবে কিনা তা এখনো বলা কঠিন। অনেক কিছুই নির্ভর করছে বিএনপি কীভাবে উপর্যুক্ত সংস্কার প্রস্তাবসমূহকে বিশদ রূপ দিবে হবে এবং কীভাবে এসব সংস্কারের কার্যকারিতার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক বাতাবরণ এবং সাংস্কৃতিক শর্তাদি প্রয়োজন তা পূরিত হবে।

২.৫ প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিএনপির প্রতিশ্রুতি

প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত বিএনপির প্রতিশ্রুতিসমূহ মূলত ইশতেহারের "রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার" শীর্ষক প্রথম ভাগের "সুশাসন" শীর্ষক উপ-ভাগে সংকলিত হয়েছে [৮, ৯]। পাঁচটি শিরোনামার অধীনে পরিবেশিত এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলি নিম্নরূপ:

(ক) দুর্নীতি দমন

[28] দ্রষ্টব্য: ইসলাম, নজরুল, ২০২৪খ, গ, ঘ, ঙ, ও চ এবং ২০২৫ক, খ।

১) দুর্নীতি দমনে পদ্ধতিগত ও আইনি সংস্কার;

২) উন্মুক্ত দরপত্র ও রিয়েল টাইম অডিট নিশ্চিতকরণ;

৩) সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স ও প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়ন;

৪) সরকারি ব্যয় ও প্রকল্পের 'পারফরম্যান্স অডিট' বাস্তবায়ন;

৫) অর্থ পাচার রোধ ও ফ্যাসিস্ট আমলের পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনা; এবং

৬) ন্যায়পাল নিয়োগ।

(খ) সর্বস্তরে আইনের শাসন

১) মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

(গ) জনপ্রশাসন

১) মেরিটোক্র্যাসির বাংলাদেশ বিনির্মাণ;

২) স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পাঁচ লক্ষ সরকারি শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগ;

৩) প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন;

৪) জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন;

৫) শক্তিশালী পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন;

৬) বেসরকারি চাকুরীজীবীরা যাতে প্রাপ্য ন্যায্য সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য বেসরকারি সার্ভিস রুল প্রণয়ন করা;

৭) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি ও দলীয়করণ রোধ।

(ঘ) বিচার বিভাগ

১) বিচার বিভাগের কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;

২) মামলার জট হ্রাস ও বিচারপ্রাপ্তি হয়রানিমুক্তকরণ;

৩) জুডিশিয়াল কমিশন গঠন – সুপ্রিম কোর্টের পৃথক সচিবালয়;

৪) এবং "সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল" ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

(ঙ) পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার।

বিএনপি এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের একটি সুযোগ পাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের অধ্যাদেশসমূহের নিষ্পত্তিকরণের সূত্রে। উপরে আমরা লক্ষ করেছি, ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ১১৩টি অনুমোদন এবং ২টি রহিত কিংবা রহিত ও পুনঃপ্রচলন করার পর ১৬টি পুনর্যাচাই এবং উৎকর্ষসাধনপূর্বক পরে নতুন বিল আকারের উত্থাপনের জন্য রেখে দিয়েছে। এই ১৬টি অধ্যাদেশসমূহ নিম্নরূপ:

১) গণভোট অধ্যাদেশ;

২-৩) গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার–সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ;

৪) দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ;

৫) পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ;

৬) বেসামরিক বিমান চলাচল (সংশোধন) অধ্যাদেশ;
৭) বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) অধ্যাদেশ;
৮) মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ;
৯) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা (সংশোধন) অধ্যাদেশ;
১০-১১) রাজস্বনীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা–সংক্রান্ত দুটি অধ্যাদেশ;
১২) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ;
১৩) কাস্টমস (সংশোধন) অধ্যাদেশ;
১৪) আয়কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ;
১৫) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ; এবং
১৬) তথ্য অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ।

প্রশাসন সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে নবগঠিত বিএনপি সরকার এসব অধ্যাদেশ কী ধরনের আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে। লক্ষণীয়, প্রশাসনিক সংস্কারের সাফল্যের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে বাংলাদেশ বিরাজমান প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবে কিনা। আমরা লক্ষ করেছি, মোটা দাগে নিঃসরণের উৎস দুটি – সরকারের বাজেট এবং অর্থায়ন খাত। এই উভয় উৎস থেকে নিঃসরণ রোধের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একই কথা প্রযোজ্য পুলিশ কমিশন এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের জন্য। সরকারী বাজেট থেকে নিঃসরণ হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে রাজস্বনীতি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস, এবং আয়কর সংক্রান্ত আইন। তদুপরি, শুধু ভাল আইন প্রণয়ন করাই যথেষ্ট নয়। আইনগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, তাও নিশ্চিত করতে হবে।

তার চেয়ে বড় কথা, সরকারি বাজেট এবং অর্থায়ন খাত, উভয় উৎস থেকে নিঃসরণ রোধের জন্য সংগ্রন্থিত কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজন। যেমন, উন্নয়ন বাজেট থেকে নিঃসরণ হ্রাসের জন্য প্রয়োজন হবে উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা ও পরিকৌশল (*স্ট্র্যাটেজি*) যা স্বল্প ব্যয়ে সবচেয়ে বেশী সুফল দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে এমনসব প্রকল্পের যেগুলো সমন্বিতভাবে সবচেয়ে স্বল্প সময়ে এবং কৃচ্ছতার সাথে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। এরজন্য দরকার হবে মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহে যোগ্য, নিবেদিত, এবং সৎ কর্মী। আরও প্রয়োজন হবে শক্তিশালী ও দেশপ্রেমিক পরিকল্পনা কমিশন যে দেশব্যাপী উন্নয়ন কর্মকান্ডের দক্ষ নেতৃত্ব দিতে পারবে; মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত প্রকল্পসমূহ যথার্থ কিনা, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন দর্শন ও কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, ব্যয়ের দিক থেকে কৃচ্ছতাসম্পন্ন কিনা, ইত্যাদি নির্মোহভাবে যাচাই-বাছাই করতে পারবে; এবং সবশেষে প্রকল্প গৃহীত হলে তার দক্ষ এবং অতিরিক্ত ব্যয়হীন বাস্তবায়ন তদারকি করতে পারবে। পরিচালন বাজেট থেকে নিঃসরণ হ্রাসেও বহু কিছু করণীয় আছে। জনবলের বিতরণে ভারসাম্যতা নিশ্চিত করতে হবে। যেসব জনবল প্রকৃত বিচারে উদ্বৃত্ত সেখান থেকে তা হ্রাস করে যেখানে প্রকৃত বিচারে জনবলের ঘাটতি রয়েছে সেখানে তা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। সামগ্রিকভাবে প্রশাসন যন্ত্রের আকারের যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

অর্থায়ন খাত থেকে নিঃসরণ হ্রাসের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দক্ষ, পেশাদারি, সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তাকে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। দেশের গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকসমূহকে বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত হওয়ার মতো স্বাধীনতা দিতে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক বাতাবরণ গড়ে তুলতে হবে। উপযোগী সংহতকরণের (*কনসোলিডেশন*) মাধ্যমে ব্যাংকের সংখ্যা কমিয়ে এনে সেগুলোর উপর নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে[29]।

এসব প্রয়োজনের আলোকে বিএনপির ইশতেহারের সুশাসন সংক্রান্ত অংশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সেখানে একদিকে রয়েছে বেশকিছু সমর্থনযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, যেমন উন্মুক্ত দরপত্র ও রিয়েল টাইম অডিট নিশ্চিতকরণ, সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন, সরকারি ব্যয় ও প্রকল্পের "পারফরম্যান্স অডিট" বাস্তবায়ন। অন্যদিকে রয়েছে কিছু সাধারণীকৃত লক্ষ্য যেগুলো কীভাবে অর্জিত হবে তা জানা যায় না। যেমন, "জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠন" অথবা "মেরিটোক্রাসির বাংলাদেশ নির্মাণ"। আরও কিছু কর্মসূচি রয়েছে, যেগুলোকে জনতুষ্টিমূলক বলে মনে হয় এবং যার ঢালাও বাস্তবায়ন সঙ্গত নাও হতে পারে। যেমন, "স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পাঁচ লক্ষ সরকারি শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগ"। এরূপ পদক্ষেপ নেওয়ার আগে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন এতগুলো পদের আসলেই প্রয়োজন আছে কিনা। মনে রাখতে হবে, যেকোনো সরকারি সংস্থার অন্তর্নিহিত প্রবণতা হলো নিজের আকার বৃদ্ধি, কারণ এর জন্য তার নিজের কোনো অর্থব্যয় করতে হয় না, বরং তার বাজেট আরও বৃদ্ধি পায়। লক্ষণীয়, প্রশাসনযন্ত্র সাধারণত নিজে কোনো বাজারযোগ্য পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে না। প্রশাসনযন্ত্রের মূল কাজ হলো ব্যক্তিখাতে অধিকতর পণ্য ও সেবা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা। অর্থনীতির তুলনায় প্রশাসন যন্ত্র অতি বড় হলে তা বরং অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাজেই চেষ্টা করতে হবে যাতে যথাসম্ভব ছোট আকৃতির প্রশাসনযন্ত্র দ্বারা যথাসম্ভব বড় অর্থনীতিকে সচল রাখা এবং বিকশিত করা যায়।

সরকারী প্রশাসনকে ঠিক কীভাবে দুর্নীতিমুক্ত করবে সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা বিএনপির ইশতেহারে পাওয়া যায় না। সুশাসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনায় সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পারিতোষিকের যৌক্তিকীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেখানে লক্ষ করা হয় যে, পারিতোষিকের যৌক্তিকীকরণ প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত থাকতে এবং আন্তরিকতা, দক্ষতা, সততার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আশা করা গিয়েছিল যে, ড. ফরাসউদ্দীনের নেতৃত্ব গঠিত ২০১৩ সালের বেতন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মীদের বেতন একলাফে প্রায় দ্বিগুণ করার ফলে প্রশাসনে দুর্নীতি হ্রাস পাবে এবং সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বাস্তবে সে ধরনের পরিবর্তন ঘটে না। ঘনিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দেখায় যে, পরিশাসনের বিদ্যমান নিঃসরণ মডেলের কারণে অসাধু সরকারি কর্মকর্তাদের কর্তৃক অনৈতিক ও অবৈধ আয়ের পরিমাণ বৈধ আয়ের তুলনায় এত বেশি যে, বৈধ বেতন দ্বিগুণ হলেও তাদের জন্য প্রযোজ্য প্রণোদনা কাঠামোতে তা তেমন রেখাপাত করে না। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেল থেকে বেড়িয়ে আসাটা খুবই জরুরী[30]।

[29] দ্রষ্টব্য ইসলাম (২০২৫ক, খ)।

[30] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য (২০২৫খ)।

২.৬ সুশাসন অর্জনে বিএনপি সরকারের এ যাবত পদক্ষেপসমূহের মূল্যায়ন

সুতরাং, সুশাসন অর্জনের লক্ষ্যে বিএনপির ইশতেহারে অনেক ভাল প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিএনপি সরকার এখন পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপে নিয়েছে তার কিছু বরং উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। তারমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের গভর্নর পদে নিয়োগ। দেশের ব্যাংকিং খাতের চরম অব্যবস্থাপনা এবং এই খাত কর্তৃক বিপুল নিঃসরণের শিকার হওয়ার কারণে আশা করা গিয়েছিল যে, নবগঠিত বিএনপি সরকার এই খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবে এবং একজন পেশাধারী, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংযোগবিহীন, এবং আস্থাউদ্রেককারী ব্যক্তিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর পদে নিয়োগ দিবে। এই প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে নবগঠিত বিএনপি সরকার কর্তৃক পেশাদারিত্ববিহীন একজন ব্যবসায়ী, যিনি নিজেই ঋণখেলাপি, তাঁকে নিয়োগ প্রদান অনেককেই হতাশ করেছে। রাজনৈতিক সংযোগই যে এই নিযুক্তির মূল কারণ বলে মনে হয়। এ ধরণের একজন গভর্নর দিয়ে কীভাবে অর্থায়ন খাতে সুশাসন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে সে প্রশ্ন অনেকের মনে দেখা দিয়েছে।

১০ এপ্রিল সংসদে পাশকৃত "বাংলাদেশ ব্যাংক রেজুল্যুশন আইন ২০২৬" ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি করেছে। এই আইনের ১৮(ক) ধারায় যেসব ব্যক্তি মালিকানাধীন রুগ্ন ব্যাংক ইতিপূর্বে সরকার অধিগ্রহণ করেছিল এবং সরকারি অর্থ দিয়ে পুনঃপুঁজিভবনের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, সেগুলোর প্রাক্তন মালিকদের খেলাপি ঋণের মাত্র মাত্র ৭.৫ শতাংশ পরিশোধ (এবং বাকীটা ১০ শতাংশ সুদসহ পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে পরিশোধ) করার মাধ্যমে ব্যাংকের উপর স্বীয় মালিকানা ফেরত পাওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধান অনেককেই ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁদের মতে এর মাধ্যমে পুনরায় গণপুঁজি আত্মসাৎ করাকে বৈধতা প্রদান করা হলো, এবং তা ভবিষ্যতে এরূপ আত্মসাৎকরণকে আরও উৎসাহিত করবে[31]। ফলে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিএনপি সরকার কতটা সফল হবে তা এখন প্রশ্নের বিষয়। আগামীতে বিএনপি যদি এই ধারায় অগ্রসর হয় তাহলে নিঃসন্দেহে প্রবৃদ্ধির নিঃসরণ মডেলের অবসান এবং সুশাসন অর্জনে বিএনপির সফল হওয়া কঠিন হবে।

৩) আনুপাতিক নির্বাচন

৩.১ বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচনের দাবির ইতিহাস ও উপযোগীতা

কিছুকাল আগেও আনুপাতিক নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশে তেমন আলোচনা ছিল না। সিপিবিসহ কিছু বামপন্থী দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে আনুপাতিক নির্বাচনের দাবি করতো; কিন্তু তাদের আলোচনাতেও এটা তেমন গুরুত্ব পেত না[32]। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর এ দাবিটি আরও বহু দল গ্রহণ করে এবং প্রায় যেন সর্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়।

---

[31] দ্রষ্টব্য "Bank Resolution Act" effectively reinstates looters: experts," *The Daily Star*, April 25, 2026.

[32] বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচন নিয়ে আলোচনার সূচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam, Nazrul (2001, 2008, 2016) এবং ইসলাম, নজরুল (২০১১১খ)। পরবর্তী আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম, নজরুল (২০২৪খ, গ, ঘ, ঙ, চ, এবং ২০২৫ক, খ, ঙ, চ)।

সুবিদিত যে, আনুপাতিক নির্বাচনের কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো সমভাবে ভৌগলিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের সমস্যা। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর জন্য এই সমস্যা ততো গুরুত্বপূর্ণ না, কারণ সেসব দেশে স্থানীয় সরকারই স্থানীয় উন্নয়নের বিষয়ে মূল ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে, সংসদ সদস্যদের ভূমিকা মূলত সমগ্র দেশের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা প্রণয়নের উপর নিবদ্ধ হয় এবং স্থানীয় উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করতে হয় না। দুর্বল স্থানীয় সরকারসম্পন্ন দেশে সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সমস্যার দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। বাংলাদেশে এ অবস্থাটি চরমে পৌঁছেছে। এখানে স্থানীয় উন্নয়নকেই সাংসদদের মূল ভূমিকা বলে গণ্য করা হয়। সম্প্রতি (১২ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও আমরা তা লক্ষ করলাম। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সব দলের সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিশ্রুতি দিতেই ব্যস্ত দেখা গেছে। জাতীয় পর্যায়ে নীতির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান নিয়ে বক্তব্য কমই দেখা গেছে। স্থানীয় উন্নয়নের সাংসদদের ভূমিকা বিধিবদ্ধ করার জন্য আগের সরকারগুলোর আমলেও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে, নবগঠিত বিএনপি সরকার উপজেলা প্রশাসনিক ভবনে সাংসদদের অফিসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মাধ্যমে দিয়ে সে ধারায় আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেন "ডিম আগে, নাকি মুরগী আগে!" ধরনের সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। শক্তিশালী স্থানীয় সরকার না থাকার কারণে সাংসদদের স্থানীয় উন্নয়নের দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। অন্যদিকে সাংসদেরা স্থানীয় উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করার ফলে স্থানীয় সরকার বিকশিত ও শক্তিশালী হতে পারছে না।

এই পরিস্থিতির অবসানের জন্য বর্তমান আসনভিত্তিক বির্বাচন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে জাতীয়ভিত্তিক আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণই সঠিক হবে। আনুপাতিক নির্বাচনের অন্যান্য বহু সুফলেরও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে নীতিগতভাবে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার পক্ষপাতীদেরও পূর্ণরূপে আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে পরিবর্তে মিশ্র ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে দেখা যায়। মিশ্র ব্যবস্থার বহুরূপ রয়েছে[33]। একটি রূপ হলো সংসদকে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট করা এবং তার একটিকে আনুপাতিক এবং অন্যটিকে আসনভিত্তিক করা। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিশন এবং সংবিধান কমিশন এরূপ মিশ্র পদ্ধতির সুপারিশ করে। এই সুপারিশমতে বাংলাদেশের সংসদের একটি নিম্ন এবং একটি উচ্চ কক্ষ থাকবে। নিম্ন কক্ষটি বর্তমান সংসদের মতো ৩০০ আসনভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে। পক্ষান্তরে উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ১০০ এবং তাঁরা জাতীয় ভিত্তিতে আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবেন।

৩.২ আনুপাতিক নির্বাচন ও সংসদের উচ্চকক্ষ সম্পর্কে বিএনপির প্রতিশ্রুতি

বিএনপিও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের পক্ষে অবস্থা নিয়েছে। কিন্তু, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "সুশাসন" বিষয়ক আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, অন্তর্বর্তী সরকারের ঐকমত্য কমিশনের সাথে বিএনপির দুটি ইস্যুতে বিরোধ দেখা দেয় । প্রথমটি হলো উচ্চকক্ষের গঠন পদ্ধতি নিয়ে। বিএনপির মতে, নিম্নকক্ষে বিভিন্ন দল প্রাপ্ত *আসনসংখ্যার* অনুপাত অনুযায়ী উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। পক্ষান্তরে, ঐকমত্য কমিশনের মতে, নিম্নকক্ষের নির্বাচনে বিভিন্ন দল প্রাপ্ত *ভোটের* অনুপাত অনুযায়ী উচ্চকক্ষ গঠিত হবে। দ্বিতীয় বিরোধ হলো, উচ্চকক্ষের এখতিয়ার নিয়ে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ

[33] দ্রষ্টব্য ইসলাম (২০২৪গ, চ, ২০২৫খ)।

করেছি যে, জুলাই সনদ জানায় যে, বিএনপি উচ্চকক্ষের নিম্নে (ক) এবং (ঙ)-তে বর্ণিত এখতিয়ারের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে।

- (ক) উচ্চকক্ষ "নিম্নকক্ষের প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে। উচ্চকক্ষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না; তবে কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষ বরাবর প্রস্তাব করতে পারবে। নিম্নকক্ষে পাশকৃত অর্থবিল ও আস্থাভোট ব্যতীত সকল বিল উচ্চকক্ষে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হতে হবে। এবং
- (ঙ) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো বিল উচ্চকক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করতে হবে।

এসবের পরিবর্তে বিএনপি ঠিক কী চায়, তা পরিষ্কার নয়। দ্বিতীয়টি, তথা (ঙ)'র, বিষয়টি সম্ভবত তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট। বিএনপি চায় না সংবিধান সংক্রান্ত কোনো বিল উচ্চকক্ষে উপস্থাপিত হোক। ধারণা করা হয় যে, একইভাবে বিএনপি চায় না যে, অর্থ বিল, আস্থা ভোট, এবং জাতীয় নিরাপত্তা (যুদ্ধ পরিস্থিতি) সংক্রান্ত বিল উচ্চকক্ষে প্রেরণ করা হোক। কোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উচ্চকক্ষ আইন প্রণয়নের জন্য নিম্নকক্ষের নিকট প্রস্তাব করুক, সেটাও বিএনপির মনঃপুত নয়। পরে যখন বিএনপি সরকার উচ্চ-কক্ষ গঠন সংক্রান্ত বিল সংসদে পেশ করবে তখন এসব বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা পাওয়া যাবে।

বলা দরকার যে, বিএনপি যে ভোটানুপাত অনুযায়ী সংসদ গঠনে সম্মত হবে না এ বিষয়টি আগেই অনুমান করা গিয়েছিল[34]। শুধু বিএনপি বলে কথা নয়। ভোটারদের মধ্যে সরল সংখ্যগরিষ্ঠতা আছে বলে অনুমানকারী যেকোনো দলের পক্ষেই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মত হওয়ার কথা। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। সাধারণ পরিস্থিতিতে এই প্রতিবন্ধকতা এড়ানোর একটি উপায় হলো আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে আসন্ন নির্বাচনের পরিবর্তে কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য প্রযোজ্য করা, কেননা কোনো দলের পক্ষে আসন্ন নির্বাচনে স্বীয় সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যতটা সহজ, দূরবর্তী নির্বাচন সম্পর্কে সেটা হওয়া ততটা সহজ নয়। অন্যদিকে, সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এমন সকল দলের পক্ষেই আনুপাতিক নির্বাচন দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথা। বাস্তবের এই হিসাব সকল দলকে কিছুটা দূরবর্তী নির্বাচন থেকে প্রযোজ্য আনুপাতিক নির্বাচন গ্রহণে সম্মত করতে পারে[35]। বিপ্লবী পরিস্থিতিতে হয়তো নির্বাচন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য এত অপেক্ষার প্রয়োজন না হতে পারে। বাংলাদেশে যে সহসা আনুপাতিক নির্বাচনের প্রবর্তন সম্ভব হলো না, তা হয়তো আরেকভাবে প্রমাণ করে যে, অনেকে দাবি করলেও জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সে অর্থে বিপ্লব ছিল না।

[34] দ্রষ্টব্য ইসলাম, নজরুল (২০২৫ঙ, চ)।

[35] এটা হলো প্রখ্যাত দার্শনিক জন রউলসে'র "Veil of ignorance" যুক্তি-রচনার মতো। রউলস সেটা করেছেন অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থার পক্ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। যখন অর্থনীতিতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মধ্যে "সম্পদ বিতরণ" সম্পর্কে অনবধান, তখন তাঁরা সকলেই বাজার ব্যবস্থার পক্ষাবলম্বী হতে পারেন। পক্ষান্তরে যখন অংশগ্রহণকারীরা এই বিতরণ সম্পর্কে জানেন তখন যারা বেশি সম্পদের অধিকারী তাঁরা বাজার ব্যবস্থার পক্ষাবলম্বন করবেন, পক্ষান্তরে যারা স্বল্প সম্পদের অধিকারী তাঁরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করবেন। ফলে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। দ্রষ্টব্য Rawls (1971)।

বিএনপি যে উচ্চকক্ষকে মূলত একটি "অলংকারিক প্রতিষ্ঠান" হিসেবে দেখে, সেটা তাদের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে প্রকাশিত ৩১ দফা কর্মসূচিতেই স্পষ্ট হয়েছিল। সেখানে ৮নং দফায় এ সম্পর্কে নিম্নরূপ বক্তব্য রাখা হয়েছিল:

> "সংবিধানের এককেন্দ্রিক চরিত্র অক্ষুন্ন রেখে বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতার লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও অন্যান্য পেশাজীবীদের সমন্বয়ে সংসদে ১০০ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষ প্রবর্তন করা হবে।"

এ থেকে স্পষ্ট যে, বিনএপি'র ধারণামতে উচ্চকক্ষ হবে অনেকটা উপদেষ্টা পরিষদের মতো, যার কার্যকর তেমন ভূমিকা থাকবে না। এখন যেহেতু বিএনপি সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী হয়েছে, সেহেতু উচ্চকক্ষ গঠন পদ্ধতি এবং এর এখতিয়ারের বিষয়ে বিএনপি তার মত অনুযায়ীই এ বিষয়ক সংবিধান সংশোধনী পাশ করায় সচেষ্ট হবে। প্রশ্ন হলো, বিএনপির এই বিজয় একটি pyrrhic (অনেক মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত স্বল্প উপকারের) বিজয় বলে প্রমাণিত হবে কিনা। এই উদ্বেগের কারণসমূহ নিম্নরূপ।

প্রথমত, বিভিন্ন দলকর্তৃক নিম্নকক্ষের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে যথেষ্ট এখতিয়ারসম্পন্ন উচ্চকক্ষ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সরল সংখ্যাগরিষ্ঠতাসম্পন্ন কোনো দল বা জোটের পক্ষে একচেটিয়া ক্ষমতা অধিকারী হওয়া প্রতিহত করা। নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যার অনুপাতে উচ্চকক্ষ গঠিত হলে এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না। গঠনের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চকক্ষ হবে নিম্নকক্ষেরই প্রতিবিম্ব। এমতাবস্থায় আগামীতে বিএনপির মধ্যে একচেটিয়া ক্ষমতার অনুভূতি প্রসার লাভের বিপদ থেকে যাবে। বিএনপি কি সেই বিপদ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারবে?

দ্বিতীয়ত, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অভিজ্ঞতা দেখায় যে, "বিশিষ্ট নাগরিক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও অন্যান্য পেশাজীবীদের" কাছ থেকে রাষ্ট্র পরিচালনায় যে ধরনের উপকারী ভূমিকা আশা করা গিয়েছিল, বাস্তবে তা অর্জিত হয় নি। তাদের বেশিরভাগ বরং ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছে। এ থেকে সম্ভবত প্রমাণিত হয় যে, আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসা নেতাদের পক্ষেই সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

তৃতীয়ত, যদি "বিশিষ্ট ব্যক্তি"রা রাষ্ট্র পরিচালনায় তেমন পারদর্শীতার স্বাক্ষর রাখতে না পারেন, এবং তাদের ভূমিকা মূলত পরামর্শদানেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়ে গঠিত একটি অলংকারিক উচ্চকক্ষের পেছনে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থব্যয় কী যথার্থ হবে? এ ধরনের পরামর্শ কি উচ্চকক্ষ গঠন ছাড়া অন্যান্য স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ উপায়েও পাওয়া সম্ভব নয়?

চতুর্থত, যদি উচ্চকক্ষের কার্যকর এখতিয়ার তেমন না থাকে তাহলে বহুলাংশে আনুষ্ঠানিকতার জন্য এই কক্ষের সাথে নিম্নকক্ষের বিল আদানপ্রদান কি প্রণিধানযোগ্য মূল্যসংযোজনের পরিবর্তে নেহাত কালক্ষেপনের কারণ হবে না এবং তাতে রাষ্ট্র পরিচালনা আরও শ্লথ হয়ে পড়বে না?

অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার যে, দ্বাদশ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রসংস্কারের দাবির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে বিএনপি সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনসহ অন্য কিছু দাবি মেনে নিলেও প্রকৃত অর্থে আনুপাতিক নির্বাচনের দাবি মেনে নেয় নি। উচ্চকক্ষকেও বিএনপি মূলত একটি অলংকারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছে। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার ফলে বিএনপির উপর কৌশল করে আনুপাতিক নির্বাচন ও ক্ষমতাশীল উচ্চকক্ষ চাপানোর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষাবলম্বীদের এখন যেটা করণীয় তা হলো জনগণের নিকট আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে আরও প্রচারাভিযান চালানো যাতে জনগণের এবং ভোটারদের মধ্যে আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে দুই-তৃতীতাংশ সমর্থন গড়ে ওঠে।

৩.৩ আনুপাতিক নির্বাচন ও সংসদের উচ্চকক্ষ সম্পর্কে বিএনপির এ যাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মূল্যায়ন

আনুপাতিক নির্বাচন ও সংসদের উচ্চকক্ষ সম্পর্কে বিএনপি সরকার এযাবৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তবে জুলাই সনদ আদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত "সংবিধান পরিষদে"র ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে বিএনপি সরকার ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই দুই ইস্যুতে স্বীয় অবস্থান থেকে সরে আসায় আগ্রহী নয়। জামায়াতে ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত ১১ দলীয় জোট অবশ্য দাবি করেছে যে, গণভোটে সংস্কারের পক্ষে রায়ের ফলে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট সংস্কারের সম্পর্কে বিএনপির ভিন্নমত বাতিল হয়ে গেছে এবং বিএনপি যদি তা মেনে না নেয় তবে রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁকে তা মেনে নিতে বাস্তবায়নে বাধ্য করার ঘোষণা দিয়েছে। আগামীত এবিএনপি এই চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয়।

৪) পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

৪.১ বাংলাদেশের জন্য পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বিশেষ গুরুত্ব

বাংলাদেশের জন্য পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এত ছোট আকৃতি অথচ এত বিরাট জনসংখ্যাসম্পন্ন দেশ আর পৃথিবীতে নেই। শুধু এই কারণেই বাংলাদেশের উপর "পরিবেশ পদভার" (*ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট*) এই দেশের "জৈব ধারণক্ষমতার" (*বায়োক্যাপাসিটি*) অনেক বেশি। সেজন্য পরিবেশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিলে বাংলাদেশে স্বস্তির সাথে বসবাস করা কঠিন হয়ে উঠবে। অথচ ভ্রান্ত নীতি এবং আচরণের কারণে বাংলাদেশের নদীব্যবস্থা বিপর্যস্ত, বন ও জীববৈচিত্র বিলুপ্তির দিকে, বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের ভারে ন্যুব্জ, শ্বাস ফেলার জন্য উন্মুক্ত প্রান্তর প্রায় নিঃশেষিত। তার সাথে যোগ হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি। পৃথিবীর যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট হুমকি দ্বারা সবচেয়ে আক্রান্ত, বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। সমুদ্র তীরবর্তী এবং অত্যন্ত স্বল্প গড় ভূমি উচ্চতার দেশ হওয়ার কারণে বাংলাদেশ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত নিমজ্জন ও লবণাক্ততা প্রসারের শিকার হয়েছে। তার সাথে যোগ হয়েছে নদনদীর ঋতুভেদ বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ইত্যাদি চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনা এবং রোগ-বালাই ইত্যাদি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সেজন্য নবগঠিত বিএনপি সরকারকে দেশের

পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বস্তুত এ বিষয়ে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে।

৪.২ বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের পর্যালোচনা

৪.২.১ ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে "পরিবেশ, পানি, ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে যে কর্মসূচি উপস্থাপিত হয় তার মধ্যে রয়েছে:

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন

(ক) (সবুজ বিপ্লব) ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছ লাগানো এবং ৩.৫ লাখ সবুজ কর্মসংস্থান;
(খ) (নবায়নযোগ্য শক্তি) ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে ২০% বিদ্যুৎ উৎপাদন;
(গ) (সবুজ অর্থনীতি) কার্বন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে বিলিয়ন ডলার আয়;
(ঘ) (কৃষি প্রযুক্তি) পানি সাশ্রয়ী সেচ এবং মিথেন নির্গম হ্রাসের লক্ষ্যে AWD (Alternate Wetting and Drying) প্রযুক্তির ব্যবহার।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পানি ব্যবস্থাপনা

(ক) (জলাধার রক্ষা) নদী-খাল ও পাহাড় দখলদারদের শাস্তি প্রদান ও গ্রিন-ক্যানেল ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন;
(খ) (পানি নিরাপত্তা) তিস্তা মহাপরিকল্পনা ও গঙ্গা ব্যারেজ বাস্তবায়ন;
(গ) যৌথ নদী কমিশন শক্তিশালীকরণ;
(ঘ) আন্তর্জাতিক নদনদী বিষয়ে জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ

(ক) (সার্কুলার মডেল) বর্জ্যকে সম্পদের রূপান্তর করতে জেলা পর্যায়ে 'মেটেরিয়াল রিকভারি সেন্টার' ও ই-বর্জ্য কারখানা স্থাপন;
(খ) (3R নীতি) প্লাস্টিক বর্জ্য ৩০% হ্রাস এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ ও জৈব সার উৎপাদন;
(গ) (পরিবেশ রক্ষা) ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও রাসায়নিক নিষিদ্ধকরণ এবং ঢাকার দূষণ রোধে বিশেষ অগ্রাধিকার।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

(ক) জাতীয় "সার্চ এন্ড রেসকিউ ইউনিট" গঠন এবং প্রতিটি বিভাগে এয়ার এম্ব্যুলেন্স/হেলিকপ্টার নিশ্চিতকরণ;
(খ) (ফায়ার সেফটি) প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক ফায়ার-রেসকিউ সেন্টার এবং "বিল্ডিং ফায়ার সেফটি কোড ২০২৬" বাস্তবায়ন;
(গ) (পুনর্বাসন) নদীভাঙ্গন ও ভূমিকম্প উত্তর পুনরুদ্ধারে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পুনর্বাসন প্রকল্প

এখানে যেসব কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলির অনেকগুলো সম্পর্কে তেমন বিতর্ক নেই এবং এগুলো অর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন; প্লাস্টিক বর্জ্য ৩০ শতাংশ হ্রাস (কত সালের মধ্যে তা বলা নাই); ইত্যাদি ভাল লক্ষ্য। এসব বিষয়ে বিগত সরকারের আমলে তেমন অগ্রগতি হয় নি। সুতরাং, বিএনপি সরকার যদি এসব লক্ষ্য অর্জনে সফল হয় তবে সেটা প্রশংসনীয় হবে। বর্জ্য সংক্রান্ত সার্কুলার মডেল, ইত্যাদি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কার্বন ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে এক বিলিয়ন ডলার অর্জনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে; তবে কবে নাগাদ এবং কীভাবে এটা অর্জিত হবে, সে বিষয়ে কোন ধারণা দেওয়া হয়নি।

৪.২.২ নদনদী এবং খাল-খনন প্রসঙ্গে

সুবিদিত, নদনদী বাংলাদেশের পরিবেশের মূল নির্ধারক। সেজন্য এ বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। প্রথমত, নদনদী ও পানিসম্পদ সংক্রান্ত কোনো সামগ্রিক চিন্তাধারার স্বাক্ষর বিএনপির ইশতেহারে নেই। দ্বিতীয়ত, উপরে যে চারটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির কথা উল্লেখিত হয়েছে, তাতে উৎসাহিত এবং উদ্বিগ্ন হওয়া, উভয়েরই কারণ আছে। যেমন যৌথ নদী কমিশনকে শক্তিশালী করা এবং আন্তর্জাতিক নদনদী বিষয়ক জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষরের প্রতিশ্রুতি উৎসাহিত হওয়ার মতো। আগে ধারণা করা হতো যে, ভারত-অনুরাগী নীতির কারণে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর করেনি। পরবর্তীতে দেখা গেল যে, অন্তর্বর্তী সরকার দেড় বছর ক্ষমতায় থাকা এবং একজন পরিবেশবাদী নেত্রী পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও এই সনদ স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান বিএনপি সরকার যদি অবশেষে এটা স্বাক্ষর করে তবে সেটাও উৎসাহের হবে। অভিন্ন নদনদীর উপর বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যৌথ নদী কমিশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকে শক্তিশালী করাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

অন্যত্র বিএনপি ২০,০০০ কিলোমিটার খাল খননের ঘোষণা দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটাও একটি ভাল কর্মসূচি। তবে লক্ষ করার দরকার, খালসমূহ বাংলাদেশের নদীব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। খাল হলো একটি প্রবাহমান জলাধার। অর্থাৎ, সকল খাল কোনো একটি নদী থেকে উৎপত্ত হয় এবং আবার নদীতে গিয়ে মিশে। সুতরাং, খালসমূহকে পুনরুদ্ধার এবং সতেজ করতে হলে নদীসমূহকে বর্তমান মুমূর্ষ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং নদনদীর সাথে খালের মুখ উন্মুক্ত করতে হবে। তা না করে খাল খনন করা হলে কেবল লম্বাকৃতির বদ্ধ পুকুরের সৃষ্টি করা হবে, প্রবাহমান খাল পুনরুদ্ধারিত হবে না।

খাল খননের বিষয়ে একটি বড় ইস্যু হলো খননকৃত মাটি নিক্ষেপের জন্য উপযোগী স্থানের সন্ধান পাওয়া। এ যাবত বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই মাটি খালের তীরে স্তূপীকৃত হচ্ছে এবং বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে তা খালেই নিপতিত হচ্ছে। তার ফলে খাল খননের উদ্দেশ্য ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছে। অথচ খালের তীরবর্তী গ্রামসমূহে খননকৃত মাটির বহু ভাল ব্যবহার সম্ভব। যেমন যেসব এলাকা বন্যাপ্রবণ অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠার উচ্চতাবৃদ্ধির কারণে নিমজ্জনের সম্মুখীন, সেসব স্থানে ঘরবাড়ী, স্থাপনা, বস্তুত গোটা গ্রামের পাটাতন উঁচু করার জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তারজন্য

প্রয়োজন হবে গ্রামে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা যে এই কাজকে নেতৃত্ব দিতে পারে। এসব আন্তসম্পর্ক বিবেচনায় না নিলে খাল খনন কর্মসূচির ফলদায়ক হওয়া কঠিন হবে[36]।

উপরে আমরা দেখেছি, খালসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে নদীসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। সুতরাং, নদনদী বিষয়ে করণীয় সম্পর্কেও বিএনপিকে একটি সঠিক ও স্বচ্ছ ধারনায় উপনীত হতে হবে। লক্ষণীয়, আমাদের দেশে নদনদীর বর্তমান দুরাবস্থার কারণ দুটি। একটি হলো দেশের ভেতরে নদনদীর প্রতি ভ্রান্ত নীতির অনুসরণ। পাকিস্তান আমলে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিদেশী পরামর্শক এবং ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ বাংলাদেশের উপর নদনদীর প্রতি "বেষ্টনী-পন্থা" চাপিয়ে দেয়। এই পন্থার মূল কথা হলো, বেড়িবাঁধ তথা বেষ্টনী নির্মাণ করে প্লাবনভূমিকে নদীখাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এই পন্থা পশ্চিমের অনেক দেশের (যেমন নেদারল্যান্ড) জন্য উপযোগী হলেও বদ্বীপ বাংলাদেশের চরম ঋতুভেদসম্পন্ন নদনদীর জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বাংলাদেশে বর্ষাকালে নদীর পলিবাহিত পানি প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হবে এবং তার ফলে সেখানে পলিপতন হবে, ভূমি উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে, জমি ও জলাশয় নবায়িত হবে, ইত্যাদি – এটাই কাম্য। তদুপরি, এর ফলে নদীখাতে পলিপতন কম হয়, পাড় কম ভাঙ্গে, নদী গভীর ও সুস্থ থাকে। সুতরাং, বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হলো "উন্মুক্ত-পন্থা," যার অধীনে বর্ষাকালে নদীর পানি অবাধে প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পাকিস্তান এবং স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশ নদনদীর প্রতি ভ্রান্ত বেষ্টনী পন্থাই অনুসরণ করে যাচ্ছে। এবং তার অনুসরণে শুরু বেড়িবাঁধ নয়, তার সাথে আনুষাঙ্গিক শতশত স্লুইসগেট, ফ্ল্যাপগেট, রেগুলেটর, ইত্যাদি নির্মাণ করেছে, যার সামগ্রিক ফল হয়েছে একটি বিপর্যস্ত নদী ব্যবস্থা।

উপর্যুক্ত ভ্রান্ত অভ্যন্তরীণ নীতি (বেষ্টনী-পন্থা)'র সাথে যোগ হয়েছে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের নদনদী থেকে পানি প্রত্যাহার, যার সবচেয়ে বড় দুই উদাহরণ হলো গঙ্গার উপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ এবং তিস্তার উপর নির্মিত গজলডোবা বাঁধ। এসব বাঁধ হলো নদনদীর প্রতি অনুসৃত "বাণিজ্যিক পন্থা"র উদাহরণ। এই পন্থার মর্ম হলো নদীকে শুধু বাণিজ্যিক সম্পদ বলে বিবেচনা করা এবং নদীর প্রকৃতিক ভূমিকাকে অবহেলা করা। যেমন, কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার জন্য ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করেছে, কিন্তু এর ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের নদনদী, ভূপ্রকৃতি, ও সুন্দরবনের যে বিপুল ক্ষতি হলো এবং হয়ে চলেছে তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হচ্ছে না। সেজন্য দীর্ঘমেয়াদী বিচারে নদনদীর জন্য উপকারী হলো "প্রকৃতিসম্মত-পন্থা," যার অধীনে নদীর প্রকৃতিক ভূমিকার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং নদীর এমন বাণিজ্যিক ব্যবহার উৎসাহিত করা হয় না যা এই প্রাকৃতিক ভূমিকাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশর জন্য "প্রকৃতিসম্মত-পন্থা"র আরও বেশি প্রয়োজন, কারণ এই পন্থার অধীনেই কেবল নদী প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং বাংলাদেশের বদ্বীপ চরিত্র বজায় থাকবে[37]।

সুতরাং, ২০,০০০ কিলোমিটার খাল খননের কর্মসূচির সাফল্যের জন্য খালের সাথে নদনদীর সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং নদনদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে তাদের প্রতি বিদ্যমান বেষ্টনী-পন্থ পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত-পন্থা

[36] এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়,* পরিচ্ছেদ ৪ এবং ইসলাম, নজরুল (২০১৭, ২০২৩)।

[37] নদনদীর প্রতি বিভিন্ন প্রতিযোগী পন্থা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Islam, Nazrul (2016, 2020, 2022) এবং ইসলাম, নজরুল (২০২৩)।

গ্রহণ করতে হবে। এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা না করলে বিএনপি খাল খননের কর্মসূচির সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

৪.২.৩ বৃক্ষরোপণ এবং বনায়ন প্রসঙ্গে

পাঁচ বছরের মধ্যে ২৫ কোটি গাছ লাগানোও একটি ভাল কর্মসূচি হতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও বিষয়টি দেশের বনায়নের সামগ্রিক কর্মসূচির অংশ হতে হবে। একসময় বাংলাদেশের প্রায় ২৫ শতাংশ বনের অধীনে ছিল। সময়ে এটা হ্রাস পেয়ে এখন আনুমানিক ছয় শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। সেজন্য বনের আরও হ্রাস রোধ এবং অপসৃত বনের পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া দরকার। আশীর দশক থেকে "বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নে"র কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু এই কর্মসূচির অধীনে ইউক্যালিপটাস, এক্যাসিয়া, ইত্যাদি বিদেশী প্রজাতির প্রশ্নবিদ্ধ গাছ লাগানোর ফলে, অনেকের মতে, দেশের লাভের বদলে ক্ষতি হয়েছে। ২৫ কোটি গাছ রোপণ কর্মসূচি কোন ধরনের বনায়নের জন্য এবং কী ধরনের গাছ রোপণের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে। সর্বোপরি বন বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে, নইলে ২৫ কোটি গাছ রোপণের নামে অর্থের কেবল অপচয়ই ঘটবে এবং কিছু সময় পরে রোপিত বৃক্ষের সামান্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

৪.২.৪ তিস্তা সংক্রান্ত চীনা পরিকল্পনা নিয়ে সুচিন্তিত অবস্থান গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

বিএনপির ইশতেহারে প্রদত্ত কিছু প্রতিশ্রুতি উদ্বেগ না করে পারে না। তার মধ্যে অন্যতম হলো তিস্তা নদী নিয়ে চীনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পতিশ্রুতি। এই মহাপরিকল্পনা সম্পর্কে তিস্তা রক্ষা আন্দোলন, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) সহ অন্যান্য নদী ও পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন এবং বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং বিকল্প প্রস্তাবিত হয়েছে[38]। এ নিয়ে বাপা এবং বেনের পক্ষ থেকে পৃথক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে[39]। সেখানে দেখানো হয়েছে যে, ইতিপূর্বে ২০১৯ সালের "বাস্তবায়ন সমীক্ষা"র ভিত্তিতে এই প্রকল্পের বহু দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছিল। এসব দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য ২০২৩ সালে যে সংশোধিত "বাস্তবায়ন সমীক্ষা" প্রণীত হয় তাতে এই প্রকল্পের প্রস্তাবনায় আরও বেশি গোঁজামিল দেখা যায়। প্রথমত, সেখানে তিস্তা নদীর প্রশস্ততা প্রায় এক-চতুর্থাংশে হ্রাসকরণ কীভাবে অর্জিত এবং স্থায়িত্বশীল হতে পারবে তার বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিপ্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, এই প্রকল্পের ফলে শুষ্ক মৌসুমে কীভাবে সেচের জন্য এবং নৌযান চলাচলের জন্য নদীতে অতিরিক্ত পানি পাওয়া যাবে তার কোন সদুত্তর নেই। তৃতীয়ত, এই প্রকল্পে নদীগর্ভ থেকে উদ্ধারকৃত জমিকে একইসাথে দ্বিবার্ষিক প্লাবনের অধীন এবং নগরায়ন ও শিল্পস্থাপনের উপযোগী বলে দেখানো হয়। এই বিপরীতমুখী পরিণতি কীভাবে একই সাথে হতে পারে তার কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাও প্রকল্পে পাওয়া যায় না। বরং এই প্রকল্পের ফলে বন্যার প্রকোপ ও পাড়ভাঙ্গন আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই পরিস্ফুট হয়। পাওয়ার-চায়না কোম্পানি নিজেও এসব প্রশ্নের যৌক্তিকতা অনুধাবন করেছে এবং সম্ভবত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে। সে

[38] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Islam (2022, Chapter 17) এবং ইসলাম (২০২৩, পরিচ্ছেদ ১৭)।

[39] দ্রষ্টব্য ইসলাম (সম্পাদক) (২০২৫ঘ)।

কারণেই সম্ভবত বহুদিন যাবত সরাসরিভাবে এই কোম্পানির কাছ থেকে এ প্রকল্প বিষয়ে আর কোনো বক্তব্য শোনা যায় নি[40]। বস্তুত, পাওয়ার-চায়নার প্রকল্পের অধীনে এসব মৌলিক সমস্যার আসলে কোন সমাধান নেই, কারণ এই প্রকল্পটিও বাংলাদেশের নদনদীর জন্য অনুপযোগী বেষ্টনী পন্থার ভিত্তিতে প্রণীত।

বাপা ও বেনের গবেষকেরা দেখিয়েছেন যে, তিস্তা নদীর সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে নদনদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থার অধীনে। সেজন্য তিস্তার দুই তীরে বাঁধ নির্মাণের পরিবর্তে বরং এই নদীর বর্ষাকালীন প্রবাহকে দুই তীরের প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। সেলক্ষ্যে দুই পাশের সকল শাখা ও উপনদী এবং আশীর দশকে বাংলাদেশের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প নির্মণকালে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া পুরাতন খাল-নালা-ছড়া ইত্যাদির সাথে সংযোগ অবারিত করতে হবে, এবং সেগুলোকেও উন্মুক্ত করতে হবে। তিস্তার পাড় ভাঙ্গন রোধ এবং অনভিপ্রেত প্রশস্ততা হ্রাসের জন্য পাওয়ার-চায়নার প্রকল্পের মতো কিছু কংক্রিট স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে "এক গুলিতে পাখি শিকারে"র চিন্তা পরিত্যাগ করে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার কথা ভাবতে হবে এবং জিও-ব্যাগ প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহারের পথ ধরতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে ভারতের কাছ থেকে তিস্তার উপর বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে এবং সেলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর করে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় জোরালো অবস্থান গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে। এই দুই ধারার প্রয়াসই কেবল তিস্তার বিষয়ে বাংলাদেশকে একটি স্থায়িত্বশীল সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

সুতরাং, পাওয়ার-চায়নার প্রকল্পের উপযোগিতা সঠিকভাবে যাচাই না করে এটা নিয়ে অন্ধের মতো নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সঠিক হবে না। এতে বাংলাদেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটবে এবং ঋণের বোঝা বাড়বে। যে বিষয়টি উপরে উল্লেখিত হয়েছে, কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী হলেও বিদেশী পরামর্শকেরা যে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও নদনদীর স্বকীয় চরিত্র উপলব্ধিতে অপারগ হয়ে ভ্রান্ত সমাধান চাপিয়ে দিতে পারেন, তার করুণ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের ইতিমধ্যে হয়েছে। সুতরাং, চীনারা উঁচু মানের প্রকৌশলী বলেই যে বাংলাদেশের নদী বিষয়ক তাঁদের প্রস্তাবিত প্রকল্প সঠিক হবে, তার নিশ্চয়তা নেই[41]। সেজন্য বিএনপি সরকার খোলা মন নিয়ে এ বিষয়ে নদী আন্দোলনকারী সংগঠনসমূহ ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে যথাযথ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে নাকি কায়েমি স্বার্থ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

৪.২.৫ প্রস্তাবিত গঙ্গা/পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প সম্পর্কে

বিএনপির ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের আরেকটি উদ্বেগ সৃষ্টিকারি প্রকল্প হলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং অন্যান্য সহযোগী সংস্থাসমূহ এই প্রকল্প নিয়ে খুব উৎসাহী, কারণ

[40] যদিও উভয় দেশের রাজনীতিবিদেরা (বিশেষ বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্টদূতের পক্ষে থেকে) এই প্রকল্প নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করছেন

[41] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন ইসলাম, নজরুল (২০২৫ঙ)।

এর প্রস্তাবিত বাজেট হচ্ছে প্রায় ৫.১৫ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৬২,০০০ কোটি টাকা[42]। এত বিশাল বাজেটে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের লাভবান হওয়ার সুযোগও বিরাট। ফলে, এসব সংস্থা এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আগে বহু চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

লক্ষণীয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং তার সহযোগীরা যখন গঙ্গা ব্যারেজের কথা বলেন তখন তাঁরা একবারও ভারতের ভেতরে ফারাক্কা ব্যারেজের অভিঘাত কী হয়েছে তা নিয়ে কিছু বলে না এবং কিংবা এই অভিঘাত সম্পর্কে কোন অনুসন্ধানের তাগিদ বোধ করে না। অথচ, বাস্তবতা হলো, প্রথমত, কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার যে মূল উদ্দেশ্যে ভারত ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ করেছিল বলে বলা হয়েছিল, তা মোটেও অর্জিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, ফারাক্কা ব্যারেজের কারণে এই বাঁধের উজানে গঙ্গার তলদেশে ক্রমাগতভাবে পলিপতন ঘটেছে এবং তার ফলে তলদেশ ভরাট হয়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নদীর পাড়ভাঙ্গন তীব্র হয়েছে। যেহেতু ফারাক্কা ব্যারেজের উজানে মাত্র কয়ক কিলোমিটার পরেই বিহার রাজ্যে সীমানার শুরু, সেহেতু ফারাক্কার এই নেতিবাচক প্রভাব দ্বারা বিহার বেশি আক্রান্ত হয়েছে। সে কারণেই ক্রমে বিহার রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিতিশ কুমারের নেতৃত্বে ফারাক্কা ব্যারাজ অপসারণের দাবিতে এক জোরালো আন্দোলন গড়ে ওঠে[43]।

২০১৬ সনে জুলাই মাসে নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সকল মন্ত্রী এবং সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ভারতের আন্তরাজ্য পরিষদ (*ইন্টার স্টেট কাউন্সিল*)'র ১১তম সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, "ফারাক্কা বাঁধ উপকারের তুলনায় বরং বেশী অপকার করেছে" এবং সে কারণে তিনি এই বাঁধ অপসারণ করে সমগ্র গঙ্গা জুড়ে বাধাহীন প্রবাহ নিশ্চিত করার দাবী জানান। একই বছরের আগস্ট মাসে বন্যা উপদ্রুত বিহারের রাজধানী পাটনায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে, বিহারের বন্যার কারণ হলো ফারাক্কা বাঁধ সৃষ্ট উজানে নদীতলে পলিপতন। এই পলি অপসারণ করে নদীর গভীরতা পুনরুদ্ধার এবং বন্যা প্রশমনের একমাত্র উপায় হলো ফারাক্কা বাঁধের অপসারণ। ভারতের জন্য ফারাক্কা বাঁধের কুফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিতিশ কুমার ২০১৭ সনের ২৫-২৬শে ফেব্রুয়ারি দুদিন ব্যাপী "অবিরাম গঙ্গা" শীর্ষক এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। ভারতের বহু স্বনামধন্য নদী গবেষক ও নদী কর্মী এই সম্মেলনে যোগ দেন এবং ফারাক্কা এবং অন্যান্য বাঁধ দ্বারা নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্থ করে পলিপতন ডেকে আনাকে গঙ্গা নদীর মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। "ভারতের জল মানব" (*ওয়াটারম্যান অফ ইন্ডিয়া*) বলে খ্যাত রাজেন্দ্র সিং এই সম্মেলনে ফারাক্কা বাঁধকে বিহারের জন্য "অশুভ" এবং "অভিশাপ" বলে অভিহিত করে এই বাঁধ অপসারণের দাবী জানান এবং মত প্রকাশ করেন যে, "যতক্ষণ পর্যন্ত তা না করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সামনে এগুতে পারছি না"। *সাউথ এশিয়ান নেওয়ার্ক ফর রিভার্স এন্ড পিপল (স্যান্ডারপ)*-এর কর্ণধার, ভারতের বিশিষ্ট নদী গবেষক, হিমাংশু থাক্কার এ সম্মেলনে লক্ষ্য করেন

[42] বিগত সরকার আমলে প্রণীত তথাকথিত "বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০"তেও এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল দ্রষ্টব্য Islam, Nazrul (2022b)।

[43] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম, নজরুল (২০২৩)।

যে, ফারাক্কা বাঁধের প্রায় ৫০ বছর পূর্ণ হয়তে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী ২০ বছর পূর্ণ হলেই এ ধরনের বাঁধের মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে তিনি ফারাক্কা বাঁধের অভিজ্ঞতার মূল্যায়নের দাবী জানান।

পাটনায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ভিত্তিতে একটি ১১-দফা বিশিষ্ট *পাটনা ঘোষণা* গৃহীত হয়, যার মূল দাবী হয় ফারাক্কা এবং অন্যান্য বাঁধ অপসারণ করে গঙ্গার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রবাহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পাটনা সম্মেলনের ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সনের মে মাসে রাজধানী দিল্লীতেও অনুরূপ আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতেও *পাটনা ঘোষণা*র অনুরূপ আরেকটি ঘোষণা গৃহীত হয়।

ভারতের অভ্যন্তরে ফারাক্কা বাঁধের এসব অভিজ্ঞতার প্রতি যথাযথ নজর না দিয়ে বাংলাদেশের পানি কর্তৃপক্ষ গঙ্গা ব্যারেজের প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে[44]। পত্রিকার খবরে প্রকাশ যে, এই প্রকল্পের "প্রাথমিক প্রস্তাবনা" পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। আরও হতাশাকর যে, অত্যন্ত জনগুরুত্বসম্পন্ন এই প্রকল্প সম্পর্কে আগের সরকারের মতো এই সরকারও যেন গোপনীয়তা অবলম্বন করছে। এই প্রকল্পের কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (*ফিজিবিলিটি স্টাডি*) পাওয়া যায় না। সামান্য যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে এই প্রকল্পের পেছনে মূল যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে তা হল যে, এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহ ধরে রাখা যাবে এবং তা দক্ষিণ-পশ্চিমের নদীসমূহে প্রবাহিত করা যাবে। ফলে এই এলাকা উপকৃত হবে এবং সুন্দরবনে মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু বড় যে দুই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না, তাহলো প্রথমত, এই বাঁধের ফলে উজানে নদীখাতে যে পলিপতন ঘটবে তার ফলে কি পাংশা (বাঁধের প্রস্তাবিত স্থান) থেকে রাজশাহী পর্যন্ত ১৪৫ কিলোমিটার জুড়ে দুই পাড়ে বন্যা এবং পাড়ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে না? অর্থাৎ, ফারাক্কা ব্যারেজ বিহারের জন্য যে পরিণতি ডেকে এনেছে, বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজও কি রাজশাহী, পাবনা, এবং কুষ্টিয়া জেলার জন্য একই ধরনের পরিণতি ডেকে আনবে না? দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের ভাটিতে ফারাক্কা ব্যারেজের কী নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা নিয়ে ভাবতে হয়নি, কেননা ফারাক্কার ভাটিতে হলো বাংলাদেশ, যার কল্যাণের কথা ভারতের কর্ণধারদের হয়তো না ভাবলেও চলে। কিন্তু গঙ্গা ব্যারেজ বাংলাদেশের জন্য একটি "zero-sum game"। এই ব্যারেজ দিয়ে যতটুকু পানি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অপসারিত হবে, বাংলাদেশের পূর্বদিকের ভাটি অঞ্চল ঠিক ততটুকুই পানি-বঞ্চিত হবে। এই বঞ্চনার প্রভাব পড়বে আঁড়িয়াল খাঁ এবং পাংশার অন্যান্য পূর্ব দিকের নদীতে এবং শেষ পর্যন্ত মেঘনা মোহনাতে। ফলে, সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মেঘনা মোহনা দিয়ে আরও গভীরে প্রবেশ করবে, এবং এমনকি হাওড় অঞ্চলেও পৌঁছাতে পারে। গঙ্গা ব্যারেজ নিয়ে উৎসাহীদের এসব নেতিবাচক অভিঘাতের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে।

সুতরাং, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প নিয়ে নবগঠিত বিএনপি সরকারে এগিয়ে যাওয়া মোটেও সমীচীন হবে না। গঙ্গা ব্যারেজের মিথ্যা আশ্বাসের পেছনে ছোটার পরিবর্তে বরং এই সরকারের উচিত হবে গঙ্গার সাথে দক্ষিণপশ্চিমের সকল নদনদীর মুখ উন্মোচনে ব্রতী হতে পারে, যাতে শুষ্ক মৌসুমে না হলেও অন্তত বর্ষা মৌসুমে

[44] দ্রষ্টব্য নজরুল ইসলাম, "প্রস্তাবিত পদ্মা ব্যারেজ – একটি অপচয়মূলক এবং ক্ষতিকর প্রকল্প," *প্রথম আলো*, ১২ মে, ২০১৬।

গঙ্গার পানি এসব নদনদীতে ঢুকতে পারে এবং সুন্দরবনে পৌঁছায়। এ ক্ষেত্রে সম্প্রতিকালে গঙ্গার বাম দিকের গুরুত্বপূর্ণ শাখা নদী বড়ালের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। ১৯৮৪ সালে বড়ালের উৎসমুখে (চারঘাটে) একটি সংকীর্ণ স্লুইসগেট নির্মাণের ফলে গঙ্গা থেকে এই নদীতে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু শুষ্ক মৌসুমে নয়, এমনকি বর্ষাকালেও গঙ্গার পানি বড়ালে পৌঁছাত না। কিন্তু বাপা ও বেনের আন্দোলনের ফলে গত বছর এই স্লুইস গেট সামান্য অপসারিত হওয়ার ফলে গঙ্গার পানি বড়ালে কলকল করে প্রবাহিত হতে শুরু করে। একটি মরা নদী পুনরায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, এবং এই "অলৌকিক" ঘটনা দেখার জন্য এলাকার হাজার হাজার মানুষ চারঘাটে ভীড় করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে নদনদীসমূহে বর্ষাকালে গঙ্গার প্রবাহ না পৌঁছানোর মূল কারণ হলো পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক এসব নদনদীর মুখে স্লুইসগেটসহ অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি। সুতরাং, প্রথম করণীয় হতে হবে এই সকল প্রতিবন্ধকতার অপসারণ, নদনদীসমূহকে দখলমুক্ত করা, এবং উন্মুক্ত করা। প্রয়োজনীয় খনন সাধন এই বৃহত্তর কার্যক্রমের অংশ হতে পারে।

দ্বিতীয় করণীয় হলো ভারতের কাছ থেকে গঙ্গা প্রবাহের বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায়। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের সনদ স্বাক্ষর করে এই সনদকে আন্তর্জাতিক এবং দ্বিপাক্ষিক কাঠামোতে গঙ্গা প্রবাহের ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশকে সরকারি এবং নাগরিক পর্যায়ে ভারতের জনমতকে নদনদীর প্রতি ও বেষ্টনী পন্থার বিরুদ্ধে প্রভাবিত করতে হবে, যাতে ভারত অভিন্ন নদনদী থেকে পানি প্রত্যাহার বন্ধ করে এবং শুষ্ক মৌসুমের প্রাকৃতিক প্রবাহকে অবাধ করে দেয়। সারা বিশ্বে ক্রমশই নদনদীর প্রতি বাণিজ্যিক পন্থার পরিবর্তে প্রকৃতিসম্মত পন্থার আবেদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশকে চেষ্টা করতে হবে নদনদীর প্রতি এই নতুন দর্শনকে উৎসাহিত করা। ভাটির দেশ হিসেবে এটাই নদনদী বিষয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পরিকৌশল। আশা করা যায় যে, বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে এবং নদনদী বিষয়ক নীতি ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত করতে সক্ষম হবেন।

৪.৩ পরিবেশের সুরক্ষা সম্পর্কে বিএনপি সরকারের এ যাবত গৃহীত পদক্ষেপের মূল্যায়ন

নবগঠিত বিএনপি সরকার পরিবেশের বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে। যেমন প্রধানমন্ত্রী গাছ লাগানোর কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, গাছ লাগানো একটি ভাল উদ্যোগ। তবে গাছ লাগানো একটি বিক্ষিপ্ত তৎপরতা না হয়ে বরং সুচিন্তিত কর্মসূচি হতে হবে। যেমন, চকোরিয়ার বাদাবন (ম্যানগ্রোভ), গাজীপুরের বিলীন হওয়া শালবন, মধুপুরের হারিয়ে যাওয়া বনের পুনরুদ্ধার, ইত্যাদি এই কর্মসূচির একটি অংশ হতে পারে। অতীতে সামাজিক বনায়নের নামে "জাম-বট-কাঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের" বাংলাদেশকে ইউক্যালিপটাস, একাসিয়া, ইত্যাদি বিতর্কিত বিদেশী গাছের দেশে রূপান্তরিত করা হয়েছে। গাছ লাগানোর নতুন এই কর্মসূচি সেই প্রবণতাই আরও জোরালো করে কিনা, তা একটি দেখার বিষয়। তদুপরি, গাছ শুধু লাগালেই হবে না সেগুলো যাতে সঠিকভাবে বড় হতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী দিনাজপুরে যেয়ে খাল খননের কর্মসূচিরও সূচনা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, খালখননও ভাল উদ্যোগ। কিন্তু এলোমেলোভাবে খননের মাধ্যমে তেমন সুফল অর্জন করা যাবে না। খালখননকে দেশের নদীব্যবস্থার

পুনরুজ্জীবনের এক বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ হতে হবে। এই পুনরুজ্জীবনের জন্য নদনদীর প্রতি বর্তমান বেষ্টনী-পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত-পন্থা গ্রহণ করতে হবে[45]।

এছাড়া বিএনপি সরকার পাওয়ার-চায়নার তিস্তা মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে[46], এবং পানিসম্পদ মন্ত্রী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের "প্রাথমিক প্রস্তাবনা" (পিডিপিপি - প্রিলিমিনারি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁরা আশা করছেন যে, শীঘ্রই এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে এবং এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু হবে। উভয় সংবাদই দুশ্চিন্তাকর। বিএনপি সরকারের উচিত হবে এসব প্রকল্প সম্পর্কে অবিমৃষ্যকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। বরং, এসব জনগুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের নিকট লভ্য করে উন্মুক্ত গণ-আলোচনার আয়োজন করা। বাপা, বেন, এবং অন্যান্য সংগঠন এসব ইস্যু নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করছে। তাদের গবেষণা এবং মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা ঋদ্ধ হওয়ার চেষ্টাও দেশের জন্য মঙ্গলকর হবে।

৫) গ্রাম সরকার/পরিষদ গঠন

৫.১ গ্রাম সরকার/পরিষদের প্রয়োজনীয়তা

ঘনিষ্ট বিশ্লেষণ দেখায় যে, স্থানীয় সরকার কাঠামোকে গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রস্তাবের পেছনে মূল যুক্তি দুটি। প্রথমত, এর ফলে দেশের সরকার গামাঞ্চলের জনগণের আরও কাছাকাছি পৌঁছাবে এবং তার ফলে একদিকে গ্রামবাসীদের কর্তৃক সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা পাওয়া সুগম হবে। অন্যদিকে, সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্য এবং করণীয় সম্পাদনে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা পাওয়া সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মূল সম্পদ হল জমি-জল-জন। কিন্তু এসবের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রায়শ যৌথ উদ্যোগ এবং প্রয়াসের প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের প্রয়াস ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবে তা হতে পারছে না। গ্রাম সরকার/পরিষদ গঠিত হলে এই অভাব পূরিত হবে এবং দেশে নীচ-থেকে-উপর অভিমুখী একটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সূচিত হবে যা দেশের উন্নয়নকে গণমুখী চরিত্র দিতে সহায়ক হবে।

৫.২ বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ার ইতিহাস

[45] দ্রষ্টব্য Islam (2016, 2020, 2022) এবং ইসলাম (২০২৩)।

[46] তবে অতি সম্প্রতি পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী এনি তিস্তা মহাপরিকল্পনার বিষয়ে দেশীয় পারদর্শীতার ব্যবহারের কথা এবং বিদেশী ঋণের পরিবর্তে সরকারের নিজস্ব অর্থের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার কথাও বলেছেন। এটা যদি সরকারের নতুন অবস্থান হয় তবে সেটা ইতিবাচক।

সুবিদিত যে, ঐতিহাসিকভাবে আমাদের দেশে "গ্রাম-পঞ্চায়েত" নামে প্রতিষ্ঠান বিরাজ করেছে[47]। এই প্রতিষ্ঠান একদিকে গ্রামের অভ্যন্তরীণ জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াসের নেতৃত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে, উপরিস্থ শাসন কাঠামোর সাথে গ্রামবাসীদের সম্পর্কের মধ্যস্থতা করেছে। বৃটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে গ্রাম-পঞ্চায়েতসমূহ অবহেলিত হয়। তদুপরি, ১৮৮২ সালে লর্ড রিপনের উদ্যোগে গৃহীত "বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইন ১৮৮৫"'র অধীনে "ইউনিয়ন" নামক একটি নতুন প্রশাসনিক এককের সূচনা করা হয় এবং তার পরিচালনার জন্য "ইউনিয়ন বোর্ড" গঠিত হয় এবং গ্রাম-পঞ্চায়েত পরিত্যাক্ত হয়। পাকিস্তান আমলে মোটামুটি এই ধারাই বজায় থাকে এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের বুনিয়াদী গণতন্ত্রে সদস্যে পরিণত করার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি বহুলাংশে জনবিরোধী চরিত্র অর্জন করে[48]।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির পুনরায় উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম উদ্যোগটি ছিল ১৯৭৫ সালের ২৬শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি। এই কর্মসূচি নিয়ে নানা বিতর্ক আছে, তবে এটি বাস্তবায়নের আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করা হয়।

জিয়াউর রহমানের আমলে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার এক বড় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেলক্ষ্যে ১৯৮০ সালে "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালা জারি করা হয়। এই বিধিমালা অনুযায়ী, গ্রাম সরকারে একজন "গ্রাম প্রধান" এবং বাকি ১২ জন সদস্য থাকবেন, যাদের মধ্যে কমপক্ষে দুজন মহিলা হবেন। গ্রাম সরকারের করণীয় হিসেবে যেসব বিষয় উল্লিখিত হয় তার মধ্যে ছিল: (ক) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) গণ-সাক্ষরতা অর্জন, (গ) পরিবার-পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, এবং (ঘ) আইনশৃংখলা রক্ষা, সালিশ, এবং স্থানীয় বিবাদ-বিরোধ নিষ্পত্তি। এ সংক্রান্ত গেজেটের টীকায় আরও উল্লেখ করা হয় যে, গ্রাম সমবায় এবং সমবায় ব্যাংক উৎসাহিত করাও গ্রাম সরকারের কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। গ্রাম সরকারকে প্রয়োজনে সর্বোচ্চ চার সদস্য বিশিষ্ট বিভিন্ন কমিটি গঠনের এখতিয়ার দেওয়া হয়। স্বনির্ভর গ্রাম সরকার আইন অনুযায়ী 'স্বনির্ভর গ্রাম তহবিল' গড়ার বিধান হয়। বলা হয় যে, এই তহবিলের আয়ের সূত্র হবে: (ক) ব্যক্তির অনুদান, (খ) গ্রাম সমবায় সমিতি অথবা কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্তৃপক্ষের সূত্রে আয় অথবা অনুদান, এবং (গ) অন্য কোনো বৈধসূত্রের আয়। ১৯৮০ সালে গ্রাম সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচিত সদস্যদের একটি মহাসমাবেশ রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যা এবং ক্ষমতার পরিবর্তনের ফলে গ্রাম সরকার সংক্রান্ত তাঁর প্রচেষ্টা আর অগ্রসর হতে পারেনি।

পরবর্তীতে বাংলাদেশে যত সরকার এসেছে, প্রায় সবগুলিই গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠনিক কাঠামো গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। যেমন জিয়ার পর এরশাদ ক্ষমতায় এলে তিনি গ্রাম সরকার বাতিল করে "পল্লী পরিষদ" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে "পল্লী পরিষদ আইন" প্রণয়ন করেন। তবে সেটি কার্যকর হওয়ার আগেই তিনি ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের

[47] বাংলাদেশের গ্রামের উদ্ভব এবং গ্রামের অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম, নজরুল (২০১১)।

[48] বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের গ্রামের অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম, নজরুল (২০১৭)।

মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৯৭ সালে "স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন" প্রণয়ন করে। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয় না। ২০০১ সালে পুনরায় বিএনপি সরকার গঠিত হলে আগের সরকারের আইন বাতিল করে "গ্রাম সরকার আইন ২০০৩" প্রণয়ন করে। তবে এই আইনের অধীনে "গ্রাম প্রধান" অনির্বাচিত হওয়ার কারণে তা আদালতে সংবিধানবিরোধী বলে প্রমাণিত হয়। ২০০৯ সালে পুনরায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে, কিন্তু গ্রাম পরিষদ গঠনের আর কোনো উদ্যোগ নেয় না।

৫.৩ গ্রাম সরকার সংক্রান্ত বিএনপির ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি

এই পটভূমিতে তাৎপর্যপূর্ণ যে, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রণীত বিএনপির ইশতেহারে "গ্রাম সরকারে"র কথা পুনরুল্লিখিত হয়েছে। এই ইশতেহারের প্রথম ভাগের "স্থানীয় সরকার" সংক্রান্ত উপভাগে অন্যান্য কর্মসূচির সাথে উল্লেখ করা হয় যে,

> গ্রাম সরকারের প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে একে কার্যকর করা হবে, যাতে তৃণমূল পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় [৯]।

নির্বাচনী এই প্রতিশ্রুতির আলোকে আশা করা যায় যে, নবগঠিত বিএনপি সরকার গ্রাম সরকারের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। লক্ষ করা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দীর বেশী সময়কালে দেশ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি পরিবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল। সুতরাং, গ্রামের জন্য উপযোগী কাঠামো নির্ধারণে এসব পরিবর্তনের প্রতি নজর দিতে হবে[49]। যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার মধ্যে রয়েছে

গ্রামের নাম ও সীমানা[50];
গ্রাম সরকার/পরিষদের গঠন ও পরিচালনা;
গ্রাম সরকার/পরিষদের প্রশাসনিক করণীয়;
গ্রাম সরকার/পরিষদের আর্থ-সামাজিক করণীয়;
গ্রাম তহবিল;
গ্রাম সরকার/পরিষদ ও স্বনির্ভর উন্নয়ন;
গ্রাম সরকার/পরিষদ ও জলবায়ু পরিবর্তন;
গ্রাম সরকার/পরিষদ এবং ভূমি ও বর্গা সংস্কার;
গ্রাম সরকার/পরিষদ ও গ্রামীণ পরিবেশ ও সৌন্দর্য্য রক্ষা; এবং
গ্রাম সরকার/পরিষদের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক।

[49] প্রস্তাবিত এই কাঠামোতে কী কী পরিবর্তন আনা প্রয়োজন হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং সুপারিশের জন্য দ্রষ্টব্য ইসলাম, নজরুল (২০১১, ২০১৭, এবং ২০২৫ক)।

[50] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Bertocci, Peter (1970)।

বাংলাদেশে গ্রাম সরকার/পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সংক্রান্ত ভারতের অভিজ্ঞতা এবং গ্রাম সরকার সংক্রান্ত চীনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। আশা করা যায় যে, গ্রাম সরকার প্রস্তাবের সংস্কারের ক্ষেত্রে বিএনপি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার দিকেও নজর দিবে।

৫.৪ গ্রাম সরকার/পরিষদের প্রত্যাশিত দুই মূল বৈশিষ্ট্য

ঘনিষ্ট বিশ্লেষণ দেখায় যে, বাংলাদেশে গ্রাম সরকারের নিম্নরূপ দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয় হবে। প্রথমত, গ্রাম সরকারকে যথাসম্ভব স্বয়ম্ভর হতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ১৯৮০ সালে জারীকৃত জিয়াউর রহমানের "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" বিধিমালা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই বিধিমালার শিরোনামই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, গ্রাম সরকারকে স্বয়ম্ভরতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ, গ্রামের অভ্যন্তরীণ জন-জমি-জল সম্পদের অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামের উন্নয়ন সাধনই হবে গ্রাম সরকারের মূল লক্ষ্য। এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ এজন্য প্রয়োজন কারণ বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতার পরিবর্তে পরনির্ভরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে, বৈদেশিক সূত্রের অর্থ ও পরামর্শের উপর নির্ভর করার প্রবণতা বেড়েছে। "বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা" (এনজিও) সমূহের ব্যাপক বিস্তারের ফলে এই বিদেশ নির্ভরতা এখন অন্যান্য প্রয়াসের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের অভ্যন্তরে সকল বিষয়ে সরকারি অর্থের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রবৃদ্ধির "নিঃসরণ মডেলে"র (দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত) ফলে এই নির্ভরতা এক বিকারগ্রস্থ রূপ লাভ করেছে। এই বাতাবরণে গঠিত গ্রাম সরকারকে অনেকে নেহাত সরকারি অর্থ প্রাপ্তির একটি উপায় বলে ভাবতে পারেন। সেটা হলে যৌথ প্রয়াসের ভিত্তিতে গ্রামের অভ্যন্তরে লব্ধ জন-জমি-জল সম্পদের অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন অর্জনের যে মূল লক্ষ্যে গ্রাম সরকারের প্রতিষ্ঠা সেটি বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং গ্রাম সরকার দেশে বিদ্যমান অন্যান্য সরকারি সংস্থার মতো গণখাতের অর্থ আত্মসাৎ করার আরেকটি মাধ্যমে পর্যবসিত হবে।

দ্বিতীয়ত, গ্রাম সরকারকে অরাজনৈতিক রাখতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিভক্তি অত্যন্ত করাল রূপ ধারণ করেছে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই বিভক্তি থেকে দূরে রাখা শ্রেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিককালে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনকে রাজনৈতিক দলভিত্তিক করার উদ্যোগ শুভ হয় নি। গ্রাম সরকার যাতে দলীয় রাজনীতির কলুষ প্রভাবকে গ্রাম পর্যন্ত প্রসারণের বাহন না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম সরকারকে স্বয়ম্ভর করার প্রয়াস সহায়ক হবে, কারণ দলীয় বিভক্তি সেখানেই আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয় যেখানে বৈধ কিংবা অবৈধ ও অনৈতিক উপায়ে অর্থ আত্মসাৎ এবং অন্যান্য সুবিধা অর্জনের সুযোগ থাকে।

৫.৫ গ্রাম সরকার সম্পর্কে নবগঠিত বিএনপি সরকারের পদক্ষেপ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

নবগঠিত বিএনপি সরকার গ্রাম সরকার সম্পর্কে এখনোও কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তবে ইশতেহারে প্রদত্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আশা করা যে, এই সরকার শীঘ্র এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তা করতে যেয়ে

বিএনপি সরকার গ্রাম সরকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনার কী কী সংস্কার সাধন করবে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে দেশবাসী এখনো তা দেখার অপেক্ষায় আছে।

৬) আঞ্চলিক বৈষম্য এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ

৬.১ উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য

বিগত সময়কালে বাংলাদেশের উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের প্রায় ১ কোটি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে নিম্নের চতুর্থাংশে (অর্থাৎ, মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে নীচের ১৬টি জেলায়) বসবাস করেন। আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো সম্পদগত পার্থক্য, যেটা বিষয়গত, অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সম্পদ আবার হতে পারে দুই ধরনের: বস্তুগত সম্পদ এবং মানব সম্পদ। বৈষম্যের দ্বিতীয় কারণ হলো আঞ্চলিক অথবা জাতীয় পর্যায়ের নীতি। নীতি একটা বিষয়ীগত প্রভাবক, যেটা ইচ্ছা করলে পরিবর্তিত করা সম্ভব। এই দুই ধরনের কারণের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া ঘটে। একটি অঞ্চলের সম্পদগত পরিস্থিতি নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। আবার গৃহীত নীতিমালা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান সম্পদগত পার্থক্যকে বাড়িয়ে দিতে অথবা প্রশমিত করতে পারে। প্রয়োজন হলো এমন নীতি গ্রহণ করা যা সম্পদগত পার্থক্যের অভিঘাতকে প্রশমিত করতে পারে।

বস্তুগত সম্পদের পার্থক্যের প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে যেসব দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে (ক) সমুদ্র অভিগম্যতা; (খ) জ্বালানী অভিগম্যতা; ও (গ) অন্যান্য ভৌত কাঠামোগত পার্থক্য হ্রাস। পাশাপাশি মানব সম্পদগত পার্থক্যও গুরুত্বপূর্ণ। নীতিগত বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে যেসব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন তারমধ্যে রয়েছে (ক) সরকারি বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস এবং (খ) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ।

৬.২ উন্নয়নের ঢাকা-কেন্দ্রিকতা

উন্নয়নের ঢাকা-কেন্দ্রিকতা এবং তার ফলে সৃষ্ট ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিম্নের পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট হয়। যেখানে ১৯৭৪-২০১৭ সময়কালে গোটা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক আনুমানিক ১.২ শতাংশ, সেখানে ঢাকা শহরে তা ছিল ৫.৪ শতাংশ[51]। আন্তর্জাতিক তুলনা দেখায় যে, দেশের মোট শহুরে জনসংখ্যায় সর্ববৃহৎ শহরের অংশের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ এখন শীর্ষ দেশসমূহের অন্যতম।

[51] দেখুন Ahsan (2019, পৃ. ২৪)। সেখানে আমরা আরও জানতে পারি যে, বাংলাদেশে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা দেশের মোট শহুরে জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৩২ শতাংশ)।

যেসব কারণ এই অতিবৃদ্ধির পেছনে কাজ করেছে তার কয়েকটি নিম্নরূপ। প্রথমত, একটি স্বাধীন দেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার আবির্ভাব এবং সেইসূত্রে এই শহরের প্রশাসনিক গুরুত্বের বৃদ্ধি। দ্বিতীয়ত, ঢাকা এবং তার আশেপাশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ, ঢাকার একটি শিল্প নগরীতে রূপান্তর, এবং তার সমাবেশন (*এগ্লোমারেশন*) অভিঘাত। তৃতীয়ত, দেশের বাকী নগরসমূহে কম বিনিয়োগ এবং অপ্রতুল কর্মসংস্থান (ঢাকার অতিবৃদ্ধি যার একটি কারণ)। চতুর্থত, জলবায়ু পরিবর্তন, নদীভাঙ্গন, ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে বিপন্ন এলাকা থেকে জনগণের ঢাকা নগরীতে অভিবাসন।

গবেষণা দেখায় যে, প্রথম পর্যায়ে সমাবেশন প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সহায়ক হলেও একটা মাত্রা অতিক্রম করার পর এর নেতিবাচক অভিঘাতসমূহ প্রকট হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সমাবেশনের আরও বৃদ্ধি সামগ্রিক বিচারে ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। গবেষকদের মতে ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে বর্তমানে সে ধরনের পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মতে, ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধির কারণের দেশের অন্যান্য শহরে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সাধিত হচ্ছে না এবং তার ফলে "মোট দেশজ উৎপাদন" (জিডিপি)'র ৮.৮ থেকে ১০ শতাংশ ক্ষতি হচ্ছে[52]।

উন্নয়নের ঢাকা কেন্দ্রিকতা হ্রাসের লক্ষ্যে যেসব ধারায় অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে (ক) দেশব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস; (খ) শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ; (গ) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ; এবং (ঘ) ঢাকা শহরের স্বল্পআয়ী শ্রমজীবীদের কল্যাণের প্রতি মনোযোগ প্রদান।

৬.৩ নগরায়নের সম্ভাব্য দুই সম্ভাব্য পরিকৌশল

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা দেখায় যে, নগরায়ন সাধারণভাবে দুই ধারায় অগ্রসর হতে পারে[53]। একটি হলো অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস বর্ণিত মূলত অভিবাসনভিত্তিক নগরায়ন। অন্যটি হলো "স্বস্থানে (in-situ) নগরায়ন"। শেষোক্তের আবার দু'টি মডেল পরিদৃষ্ট হয়। একটি হলো "হাব-এন্ড-স্পোক" মডেল, যেখানে একেকটি শহরকে চতুষ্পার্শের গ্রামের অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান, প্রশাসনিক সেবা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাণিজ্য, বিনোদনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সেবা, ইত্যাদি সরবরাহ করার মতো উপযোগী করে গড়ে তোলা হয় এবং গ্রামবাসীরা যাতে এসব সেবা পাওয়ার জন্য সহজে শহরে দৈনিক যাতে পারে সেজন্য দক্ষ এবং সুলভ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। এই দুই শর্ত পূরিত হলে গ্রামবাসীদের শহরে অভিবাসনের প্রয়োজন হয় না। তাঁরা গ্রামে অবস্থান করেই মোটামুটিভাবে শহরবাসীদের সমান গড় আয়ের অধিকারী হতে পারেন এবং জীবনমান উপভোগ করতে পারেন। "হাব-এন্ড-স্পোক" মডেলের একটি দৃষ্টান্ত হলো শ্রীলংকা, যে দেশটি দেশের ৮০ শতাংশ মানুষকে গ্রামে রেখেই উচ্চ-মধ্যম আয়ের স্তরে পৌঁছাতে পারে।

[52] দ্রষ্টব্য Ahsan (2019)

[53] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য United Nations (2021)।

"স্বস্থানে নগরায়ন"র দ্বিতীয় মডেলটি হল "শিল্পের গ্রামে অভিগমন"। এই মডেলে গ্রামাঞ্চলেই শিল্প স্থাপিত হয় এবং তার ফলে কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামবাসীদের শহরে অভিগমন করতে হয় না। অন্যান্য সেবাও গ্রামে লভ্য করা হয়। এই মডেলের বড় উদাহরণ হলো চীন। সেখানে ১৯৭৮ সালে কৃষি সংস্কার এবং ১৯৮৪ সালে শিল্প সংস্কার কর্মসূচি অগ্রসর হলে শহর-গ্রাম সরকারসমূহ ব্যাপকহারে নিজ নিজ এলাকায় (অর্থাৎ, গ্রামাঞ্চলে) বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে তোলে, যেগুলো "শহর-গ্রাম উৎপাদন প্রতিষ্ঠান" (*টাউনশিপ-ভিলেজ এন্টারপ্রাইজ*, সংক্ষেপে, *টিভিই*) বলে আখ্যায়িত হয়। এই প্রক্রিয়া এত ব্যাপক রূপ লাভ করে যে, একটা পর্যায়ে চীনের মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই টিভিই-সমূহে উৎপাদিত হয় এবং প্রায় ১২ কোটি শ্রমিক এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজন লাভ করেন[54]। চীনের শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই 'টিভিই বিস্ফোরণ' এবং তার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত 'স্বস্থানে নগরায়ন' তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ঘনিষ্ট বিশ্লেষণ দেখায় যে, বাংলাদেশের জন্য স্বস্থানে নগরয়নের "হাব-এন্ড-স্পোক" মডেল বেশী উপযোগী হবে। সেলক্ষ্যে বর্তমানের জেলা শহরসমূহকে "হাব" হিসেবে গ্রহণ এবং বিকশিত করা দরকার। ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত বিসিক শিল্পনগরীসমূহ এবং বিগত সরকার কর্তৃক গৃহীত ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে "হাব-এন্ড-স্পোক" মডেলের সাথে সমন্বিত করা শ্রেয় হবে।

৬.৪ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি

বিএনপির ইশতেহারে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বস্তুত ইশতেহারের মূল পাঁচটি ভাগের একটির শিরোনাম দেওয়া হয় "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন"। এই ভাগকে নিম্নরূপ ৬টি উপভাগে বিভক্ত করা হয় [২৮]:

(১) চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা;
(২) উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন;
(৩) হাওড়-বাওড় বিল;
(৪) উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;
(৫) নগরায়ন ও আবাসন এবং নিরাপদ ও টেকসই ঢাকা বিনির্মাণ; এবং
(৬) পর্যটন খাত।

এসব উপভাগের অধিকাংশের অধীনে অনেক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে তালিকাভুক্ত সকল কর্মসূচি যে আঞ্চলিক বৈষম্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তা বলা কঠিন। চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী করা বিষয়ক কর্মসূচির আর কোনো ব্যাখ্যা বিএনপির ইশতেহারে পাওয়া যায় না। সেখানে শুধু বলা হয় যে, "চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং কর্মসংস্থানের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে" [২৮]। দেশের মূল সমুদ্র বন্দর হিসেবে চট্টগ্রাম ইতিমধ্যেই দেশের বন্দর-নগরী হিসেবে স্বীকৃত। বৈদেশিক বাণিজ্যে চট্টগ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ

[54] দ্রষ্টব্য Islam (2009)

ভূমিকার কারণে চট্টগ্রামকে "বাণিজ্যিক রাজধানী" করার লক্ষ্যের পেছনেও যুক্তি থাকতে পারে। তবে চট্টগ্রাম কেন "কর্মসংস্থানের প্রধান কেন্দ্র" হবে তা স্পষ্ট নয় এবং বিএনপির ইশতেহারে তা ব্যাখ্যা করা হয় না।

সে তুলনায়, "উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন" উপবিভাগে কিছুটা বিশদ চিন্তার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সাধারণভাবে উত্তরাঞ্চলকে অবহেলিত এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয় এবং তা কাটানোর জন্য "কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন" সংঘটনের আশ্বাস দেওয়া হয়। এর সাথে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির তালিকা দেওয়া হয়। তার মধ্যে রয়েছে [২৯]:

- বিশেষায়িত রপ্তানি অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- বরেন্দ্র প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বরেন্দ্র-অঞ্চলের সকল খালের পুনর্খনন;
- আমের সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বিশেষ হিমাগার' স্থাপন করা
- তিস্তা এবং পদ্মা ব্যারেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে পানি নিরাপত্তা, বন্যা ও মরুকরণ প্রতিরোধ নিশ্চিতকরণ (এই উদ্যোগের ফলে ৭৫ লাখ হেক্টর জমি সেচ সুবিধা পাবে এবমগ ৫ কোটিরও বেশি মানুষ বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে)

এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, এবং চতুর্থটির বিষয়ে তেমন বিতর্ক নেই। বরেন্দ্র এলাকার খাল খনন কর্মসূচিও ভাল, তবে কেন খালসমূহ ভরাট হয়ে গিয়েছে তার কারণ সম্পর্কে কোনো উপলব্ধির স্বাক্ষর এখানে যাওয়া যায় না। অথচ খননের বিশদ পরিকল্পনার সঠিকতার জন্য এই উপলব্ধি প্রয়োজন। (এ বিষয়টি উপরে ইতিমধ্যে উল্লেখিত হয়েছে।) পঞ্চম কর্মসূচি হলো "তিস্তা এবং পদ্মা ব্যারেজ বাস্তবায়ন" সংক্রান্ত। তিস্তা প্রকল্প এলাকা উত্তরবঙ্গে এবং প্রস্তাবিত পদ্মা ব্যারেজের এলাকা মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশে। এই দুই এলাকাকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বলে ধারণা করা হয় বলে বিএনপির ইশতেহারের আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত ভাগে এই দুই প্রকল্পের কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই দুই প্রকল্পই অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ এবং এগুলো নিয়ে চতুর্থ অনুচ্ছেদে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। হাওড়-বাওড় সম্পন্ন এলাকাসমূহও অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং সে কারণে এগুলোর আলোচনা ইশতেহারের আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এ সংক্রান্ত তেমন কোনো বিস্তারিত কর্মসূচি প্রস্তাবিত হয় না[55]। শুধু দুর্যোগ মোকাবেলায় "টেকসই বাঁধ" নির্মাণ করার কথা বলা হয় [৩০]। তবে উপরে আমরা লক্ষ করেছি, কী ধরনের বাঁধ "টেকসই" বলে গণ্য হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে[56]।

উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে বিএনপির ইশতেহারে বেশ কিছু কর্মসূচির কথা উল্লেখিত হয়। এগুলো হলো:

- টেকসই বেড়িবাঁধ ও আধুনিক সতর্কতা ব্যবস্থার মাধ্যমে উপকূলীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- নীল অর্থনীতি ও লবণাক্ত সহনশীল কৃষিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

[55] হাওড়-বাওড় এলাকার বিষয়টি পানি সম্পদ বিষয়ক কর্মসূচির পরিবর্তে আঞ্চলিক বৈষম্য সংক্রান্ত উপবিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার কারণ সম্ভবত এই যে, হাওড়-বাওড় এলাকাসমূকে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, যদিও এর পক্ষে কোনো তথ্য বা যুক্তি পরিবেশিত হয় না।

[56] হাওড়-বাওড় প্রসঙ্গে "উপকূল উন্নয়ন বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে "নীল অর্থনীতি" ও পর্যটন বিকশিত করা"র কথাও বলা হয়। শেষোক্তটি প্রযোজ্য হলেও, "উপকূল উন্নয়ন বোর্ড" গঠনের কথা এখানে সম্ভবত ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- উপকূলীয় অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নে একটি বিশেষায়িত "উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করা;
- উপকূলীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন করতে এবং অর্থনীতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণ করা হবে;
- দেশের বৃহত্তম গঙ্গা-কপোতাক্ষ জি কে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হবে এবং এতে চার জেলার ১৩ উপজেলা, উপড়ে আমরা লক্ষ করেছি,লার হাজার হাজার কৃষক চাষাবাদে সুফল লাভ করবে [৩১]।

বাংলাদেশের জন্য বেড়ীবাঁধের অনুপযোগিতা সম্পর্কে উপরের অনুচ্ছেদে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে, বিদেশী পরামর্শকদের অনুপযোগী চিন্তাধারা অনুসারে নির্মিত স্থায়ী বেড়ীবাঁধ বাংলাদেশের উপকূলের সর্বনাশ করেছে। এর ফলে উপকূলের ভূমি পলিবঞ্চিত হয়েছে, যার ফলে ভূমি-উচ্চতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং অবনমনের সম্মুখীন হয়েছে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমবৃদ্ধির ফলে উপকূলের ভূমি এখন সমুদ্রসীমার নীচে চলে যাচ্ছে। আরও সৃষ্ট হয়েছে স্থায়ী জলাবদ্ধতা। উপকূলকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন এসব স্থায়ী বেড়ীবাঁধকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী অস্থায়ী (অষ্টমাসী) বাঁধে রূপান্তর যাতে বর্ষাকালে পলি প্রবেশ করতে পারে এবং শীতকালে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়। তা না করে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ টেকসই বেড়ীবাঁধ বলতে বর্তমানের ক্ষতিকর স্থায়ী বেড়ীবাঁধসমূহকে আরও উঁচু ও শক্তিশালী করাকেই বোঝায় এবং সেলক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থানুকূল্যে "উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প" (*কোস্টাল এমব্যাংকমেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট*) বাস্তবায়িত করছে। পরিতাপের বিষয় যে, এর ফলে উপকূলের পোল্ডারসমূহ আরও গভীর মৃত্যুকূপে পরিণত হচ্ছে। নবগঠিত বিএনপি সরকার যদি এসব বিষয়ের নির্মোহ পুনর্নিরীক্ষণ না করে পুরানো পথেই অগ্রসর হয় তবে উপকূল আরও দ্রুত নিমজ্জিত হবে। নীতি ও কর্মপন্থা ঠিক করার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে যদি "উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড" নামে আরেকটি সংস্থা গড়া হলে তাতে অর্থের অপচয় এবং ক্ষতি আরও বাড়বে। "নীল অর্থনীতি" আরেকটি বিদেশ থেকে আগত সাম্প্রতিক অভিধা যা মূল বিষয়ের প্রতি মনোযোগের পথে বরং বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণের যে কর্মসূচি বিএনপির ইশতেহারে উল্লেখিত হয়েছে, সে বিষয়ে যথাযথ সমীক্ষা সহকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শ্রেয় হবে। স্মতর্ব্য, ভোলাতে আবিষ্কৃত গ্যাসকে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সংযুক্ত করার জন্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণেরও প্রস্তাব আছে। তবে এই গ্যাস দ্বারা ভোলাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য ব্যবহারেরও প্রস্তাব আছে। স্পষ্টতই, এই প্রস্তাবের যথার্থতা নির্ভর করে ভোলা গ্যাসক্ষেত্রের প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ এবং ভবিষ্যতে আরও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনার উপর। এই সব বিষয়েই যথাযথ সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এই তালিকার সর্বশেষ কর্মসূচিতে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের "প্রয়োজনীয় সংস্কার" করার কথা বলা হয়েছে, যদিও এই সংস্কারের স্বরূপ সম্পর্কে কোন আভাস দেওয়া হয় নি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে আমরা গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি[57]। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর জেলায় বিদ্যমান প্রাকৃতিক নদী-নালা-খালকে অবহেলা করে এই প্রকল্পের অধীনে কৃত্রিম খালের নেটওয়ার্ক নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ভারত যখন ১৯৭৪ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালু করে তখন এই নেটওয়ার্ক কার্যকারিতা হারায় এবং বাংলাদেশে শুষ্ক

[57] দেখুন Islam (2020, 2022) এবং ইসলাম (২০২৩)।

মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। সুতরাং, যেটা প্রয়োজন তা হলো পূর্বেকার প্রাকৃতিক নদী-নালা-খালসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গঙ্গার সাথে এগুলোর সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাতে অন্তত বর্ষাকালে গঙ্গার প্রবাহ এগুলোতে পৌঁছাতে পারে। পাশাপাশি ভারতের কাছে থেকে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা প্রবাহের বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। তা না করে যদি সংস্কারের নামে শুধু কৃত্রিম খালগুলিকেই পুনঃখননের উদ্যোগ নেওয়া হয় তাতে বিশেষ ফললাভ হবে না।

বিএনপির ইশতেহারে "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন" ভাগের পরবর্তী উপভাগ হলো "নগরায়ন ও আবাসন এবং নিরাপদ ও টেকসই ঢাকা বিনির্মাণ"। এই শিরোনামে যেসব কর্মসূচির উল্লেখ করা হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

- পরিকল্পিত আবাসন: উর্বর জমি রক্ষায় বহুতল ও গুচ্ছ আবাসন এবং নিম্নবিত্তদের জন্য সাশ্রয়ী ফ্ল্যাট;
- সেকেন্ডারি সিটি: ঢাকার চাপ কমাতে বড় শহরগুলোতে হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর;
- ভূমি ও নাগরিক সেবা: দুর্নীতিমুক্ত 'ভূমি ব্যাংক' এবং আধুনিক বর্জ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;
- আধুনিক পরিবহন: মেট্রোরেল, মনোরেল, ইলেকট্রিক ভেহিকেল, এবং নারীদের জন্য পিংক বাস চালু;
- নৌ-পথ ও যোগাযোগ: ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ ও রিং রোড দ্রুত সম্পন্ন করা; এবং
- স্মার্ট সিটি: আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল প্লাটফর্মে সকল নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ।

এসব কর্মসূচির বেশিরভাগ "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন"'র জন্য কীভাবে সহায়ক, তা বোধগম্য নয়। বস্তুত, এগুলো আঞ্চলিক বৈষম্য আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন "ঢাকার চারদিকে বৃত্তাকার নৌপথ ও রিং রোড দ্রুত সম্পন্ন করা" হলে ঢাকার দিকে অভিবাসন আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তাতে উন্নয়ন আরও বৈষম্যপূর্ণ হবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কর্মসূচি (তালিকার প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, এবং ষষ্ঠ কর্মসূচি) শুধু ঢাকা শহরের জন্য নাকি দেশের সকল স্থানের জন্য ভাবা হচ্ছে তা পরিষ্কার নয়। শুধু ঢাকার জন্য হলে তা উন্নয়নকে আরও বৈষম্যপূর্ণ করবে। কেবলমাত্র দ্বিতীয় কর্মসূচিটি ঢাকা শহরের অতিবৃদ্ধি প্রশমনের জন্য সহায়ক হতে পারে। সূচনাতেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিএনপির ইশতেহারের যৌক্তিক গঠন ততোটা পরিচ্ছন্ন নয়। এখানে আমরা তার একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

সবশেষে এইভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "পর্যটন খাত" উপবিভাগ। এতে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

- ভিসা সহজীকরণ, এআই-ভিত্তিক ট্র্যাভেল অ্যাপ এবং দক্ষ টুরিস্ট পুলিশ নিয়োগের মাধ্যমে পর্যটনকে আকর্ষণীয় করা;
- জেলাভিত্তিক 'কমিউনিটি ট্যুরিজম,' 'ইকো-ট্যুরিজম,' এবং নদী-ভিত্তিক 'ওয়াটার-ট্যুরিজম' বিকশিত করা;
- গ্রামীণ ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বৈশ্বিক পরিচিতির জন্য বার্ষিক 'ঢাকা ফুড এন্ড কালচার ফেস্ট' আয়োজন করা হবে।

"অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন অর্জনে" এ ধরনের কর্মসূচি কীভাবে উপযোগী হতে পারে তার কার্যকারণ স্পষ্ট নয় এবং ইশতেহারে তা ব্যাখ্যার কোন প্রয়াস দেখা যায় না। বিশেষত 'ঢাকা ফুড এন্ড কালচার ফেস্ট' আয়োজনের মাধ্যমে উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের ভাবনা একটি উচ্চবর্গীয় মনোভাবের পরিচয় দেয়।

৬.৫ আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে নবগঠিত বিএনপি সরকারের পদক্ষেপসমূহের মূল্যায়ন

আঞ্চলিক বৈষম্য সহসা দূর হওয়ার মতো বিষয় নয়। এটাকে একটি মধ্য কিংবা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি বিশ্বাসযোগ্য পথরেখা থাকতে হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিএনপির ইশতেহার তেমন উৎসাহিত করতে পারেনা। "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন" ভাগে অনেক কর্মসূচির তালিকা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সেগুলোকে সমন্বিত মনে হয় না। অনেক কর্মসূচির সাথে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যের সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। সুতরাং, নবগঠিত বিএনপি সরকারের একটি করণীয় হবে "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নে"র একটি সুচিন্তত ও সমন্বিত পরিকৌশল (*স্ট্র্যাটেজি*) নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া। সে লক্ষ্যে *দশ করণীয়* গ্রন্থে পরিবেশিত আলোচনা সহায়ক হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন" ভাগে পরিবেশিত অনেক কর্মসূচি উদ্বেগের সৃষ্টি না করে পারে না। তার মধ্যে রয়েছে তিস্তা মহাপরিকল্পনা, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের সংস্কার কর্মসূচি। এসব প্রশ্নবিদ্ধ প্রকল্প নিয়ে কোনো দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ না রেখে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক হবে।

৭) সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি

৭.১ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সামাজিক সংহতির অবনতি

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি সংহত সমাজ হিসেবে অভ্যুদিত হয়েছিল। ক্রমে এই সংহতি দুর্বল হয়ে পড়ে। দুই ধরনের বিভক্তি প্রকট হয়ে ওঠে। এক ধরনের বিভক্তি হল অনুভূমিক (*হরাইজন্টাল*) এবং অন্যটি হলো উল্লম্বিক (*ভার্টিক্যাল*)।

৭.১.১ অনুভূমিক বিভক্তি

অনুভূমিক বিভক্তির মূল হলো অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভক্তি কিংবা স্তরীকরণ, যেটা আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে দেখেছি। কিন্তু অর্থনৈতিক বিভক্তি অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিভক্তি ডেকে আনে। তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং সামাজিক নিরাপত্তা। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থা এখন মোটাদাগে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ধনীদের জন্য রয়েছে ব্যক্তিখাতের ব্যয়সাপেক্ষ ইংরাজি মাধ্যমের স্কুল, কলেজ, এবং বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যআয়ের জনগণের জন্য আছে সরকারি এবং বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সবশেষে আছে দরিদ্রদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা এখন কেবল দরিদ্রদের জন্য সীমাবদ্ধ নেই। অনেক মধ্য এবং উচ্চ আয়ের পরিবারও তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠাচ্ছেন। শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রিধাবিভক্তি নিঃসন্দেহে সামাজিক সংহতির জন্য অনুকূল নয়। এমনকি তা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্যও ক্ষতিকর। শিক্ষাব্যবস্থার এই বিভক্তির অবসান কিংবা প্রশমন করে একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটানো একটি বড় জাতীয় কর্তব্য হিসেবে সমুপস্থিত হয়েছে।

একইভাবে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাও ত্রিধাবিভক্ত। ধনীদের জন্য রয়েছে ব্যক্তিখাতের ব্যয়সাপেক্ষ হাসপাতাল এবং ক্লিনিক। মধ্য আয়ের জনগণের জন্য রয়েছে সরকারি খাতের হাসপাতাল, হেলথ কমপ্লেক্স, এবং কমিউনিটি ক্লিনিক। আরও আছে একটি অংশ যারা কোনো ধরনের আধুনিক চিকিৎসার পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের বিশ্বাস-নির্ভর পদ্ধতির শরণাপন্ন হন। চিকিৎসা-ব্যবস্থার এই ত্রিধাবিভক্তিও দেশের সামাজিক সংহতি এবং উন্নয়নের জন্য অনুকূল নয়। কীভাবে বর্তমানের বিভক্তি কাটিয়ে একটি একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটানো যায়, সেটা আরেক বড় চ্যালেঞ্জ।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ধনী-গরীবের মধ্যে করাল পার্থক্য দেখা যায়। ধনীদের থাকে প্রচুর ধনসম্পদ যা দিয়ে তাঁরা বৃদ্ধবয়সেও স্বাচ্ছন্দে, চাইকি বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু দরিদ্রদের সামান্যই সঞ্চয় ও সম্পদ থাকে; ফলে বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে সন্তান এবং আত্মীয়স্বজনের উপর নির্ভর করতে হয়। শুধু বৃদ্ধবয়সের জন্য নয়, যেকোনো আপদকালীন সময়েও নিরাপত্তার এই পার্থক্য করাল হয়ে দেখা দেয়। সামাজিক নিরাপত্তার এই পার্থ্যকের অবসান ঘটিয়ে একীভূত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাও আরেকটি জাতীয় কর্তব্য।

৭.১.২ উল্লম্বিক সামাজিক বিভক্তি

অনুভূমিক পার্থক্যের পাশাপাশি বিভিন্ন উল্লম্বিক বিভক্তি বাংলাদেশের সামাজিক সংহতির পথে চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে। উল্লম্বিক বিভক্তির মূল দুটি ধারা হলো: ধর্মীয় এবং নৃতাত্ত্বিক। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকল ধর্মের মানুষ একসাথে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। সেজন্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় বিভক্তির কোন স্থান থাকার কথা ছিল না। বস্তুত, ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হয়েছিল এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের পর থেকে ধর্ম পুনরায় রাজনীতিতে প্রবেশ করে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিগ্রহের সম্মুখীন হয়। কিভাবে ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখে সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা যায় সেটা একটা বড় প্রশ্ন।

সংখ্যায় স্বল্প হলেও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও রয়েছে। প্রথমত, পাহাড়ি এলাকায় মঙ্গোলীয় নৃতত্ত্বের জনগণ বসবাস করেন। দ্বিতীয়ত, সমতল বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আর্যপূর্ব অনেক জনগোষ্ঠী বসবাস করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মঙ্গোলীয় নৃতত্ত্বের জনগোষ্ঠীর সাথে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাথে সংঘাত দেখা দেয় এবং আশীর দশকে তা সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ গ্রহণ করে। ১৯৯৭ সালে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই সামরিক সংঘর্ষের অবসান ঘটে। তবে এখনও বিরোধের অবসান ঘটেনি। পাহাড়িদের দাবি যে, শান্তিচুক্তির সকল ধারা, বিশেষত ভূমি-অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি-বাঙালি বিরোধ বজায় আছে, যা মাঝমধ্যে প্রকাশ্য এবং সহিংস রূপে বহিঃপ্রকাশিত হয়। এই মূল বিরোধের সূত্র ধরে পাহাড়িদের নিজেদের মধ্যেও বিভক্তির উদ্ভব ঘটেছে, এবং তা বিভিন্ন সময় সহিংস রূপ ধারণ করছে। সুতরাং, স্থায়ী নৃতাত্বিক সম্প্রীতি অর্জন করাও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে।

৭.১.৩ অনুভূমিক বিভক্তি নিরসনে করণীয়

যেহেতু বিভিন্ন অনুভূমিক বিভক্তির মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভক্তি, সেহেতু অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রথম অনুচ্ছেদে যেসব কর্মধারার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেগুলো অনুভূমিক সামাজিক বিভক্তিসমূহ প্রশমনেও সহায়ক হবে। তবে শেষোক্ত লক্ষ্যে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কর্মধারাও প্রয়োজন। বস্তুত, অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের *কৌশলের* সাথে অনুভূমিক সামাজিক বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যের সরাসরি সম্পর্কও রয়েছে। যেমন, প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা লক্ষ করেছি, পুনর্বিতরনের মাধ্যমে প্রাথমিক আয়ের বিতরণের অসমতা বহুলাংশে হ্রাস করা যায়। উন্নত দেশসমূহ তার দৃষ্টান্ত যোগায়। সেখানে আমরা আরও লক্ষ করেছি যে, এই পুনর্বিতরণ হতে পারে দুই পদ্ধতিতে। একটি হলো প্রত্যক্ষ, যার উদাহরণ হলো নিম্নআয়ের জনগণকে সরাসরি নগদ অর্থ প্রদান। বিএনপি সরকার কর্তৃক সদ্য প্রবর্তিত "ফ্যামিলি কার্ড" কর্মসূচি তার একটি উদাহরণ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো পরোক্ষ, যার একটি উদাহরণ হলো সরকারি সরকারি খরচে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে ধনীদের সাথে স্বল্পআয়ী পরিবারের সন্তানদের সমাধিকার থাকে। যেহেতু এই শিক্ষা ব্যবস্থার খরচ মেটানোর ক্ষেত্রে ধনীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বের বেশী ভূমিকা থাকে, সেহেতু এর মাধ্যমে পরোক্ষ উপায়ে পুনর্বিতরণ ঘটে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার সরাসরি এবং বহু বহিঃউৎসারিত ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। উন্নত প্রায় সকলে দেশেই সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কাজেই একীভূত, সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশেরও লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

৭.১.৪ শিক্ষাখাতের অনুভূমিক বিভক্তি নিরসনে করণীয়

সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট রূপের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কিছু দেশ আছে যেখানে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই গণখাতে এবং ব্যক্তিখাতের সেখানে ভূমিকা নেই। অন্যদিকে কিছু দেশে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা পুরোটা গণখাতে থাকলেও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা রয়েছে। কিছু দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে গণখাতের ভূমিকা মুখ্য হলেও ব্যক্তিখাতের ও অন্যান্য ধরনের (যেমন গীর্জাভিত্তিক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু সুযোগ দেওয়া হয়। সবশেষে, কিছু দেশ আছে যেখানে গণ এবং ব্যক্তিখাতের আপেক্ষিক ভূমিকা কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক এই অভিজ্ঞতা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ব্যক্তিখাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সুতরাং, এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই একীভূত সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবতে হবে। সেলক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মানের ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করতে হবে। বিশেষত, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইংরেজি শিক্ষার মানের গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে যাতে ব্যক্তিখাতে ব্যয়বহুল ইংরেজীমাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্তানদের পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। একইভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিজনিজ ধর্ম বিষয়ে প্রয়োজনীয় মাত্রার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে শুধু ধর্মশিক্ষার জন্য সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠানোর প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পায়। পাশাপাশি বিদ্যমান মাদ্রাসাসমূহে যাতে ন্যূনতম জাতীয় কারিকুলাম অন্তর্ভুক্ত হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতে ইতিমধ্যে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে

ব্যক্তিখাতের সফল এবং প্রতিশ্রুতিশীল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে দেওয়া যাবে না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে বাণিজ্য এবং মুনাফা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। একইসাথে গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মানের ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। বর্তমানে ব্যক্তিখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপস্থিতি গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বরং, এই দুইখাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যাতে ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেলক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে দ্বিভাষিক হতে হবে। গণখাতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজসমূহে ইংরাজি শিক্ষার মানের উন্নয়ন গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও ইংরেজির ব্যবহারের মান উন্নত করতে সহায়ক হবে। সেটা করা গেলে ব্যক্তিখাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের আকর্ষণ হ্রাস পাবে এবং উচ্চশিক্ষায় গণখাতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এভাবে বিভিন্নমুখী সবল কিন্তু ধৈর্যসম্পন্ন প্রয়াসের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান ত্রিধাবিভক্তি ক্রমশ হ্রাস করে একীভূত শিক্ষাব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান এই ত্রিধাবিভক্তি একদিনে সৃষ্ট হয় নি; তেমনি এর অবসানও একদিনে হবে না। তবে লক্ষ্য যদি পরিষ্কার থাকে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ যদি স্পষ্ট থাকে, এবং প্রয়াস যদি জোরালো এবং অব্যাহত থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তা সফল হবে।

৭.১.৪ স্বাস্থ্যখাতের অনুভূমিক বিভক্তি নিরসনে করণীয়

স্বাস্থ্যখাতকেও একীভূত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রেও উন্নত দেশসমূহে বিভিন্ন ধরনের মডেল দেখা যায়। অনেক উন্নত দেশে পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থাই সরকারি খাতে পরিচালিত হয়। যুক্তরাজ্য এবং কানাডাসহ ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ এই মডেল অনুসরণ করে। এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, চিকিৎসা একটি মৌলিক অধিকার। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বহিঃউৎসারিত ইতিবাচক প্রভাব আরও বেশী, কেননা একদিকে সুস্থ সবল জনশক্তি ছাড়া দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং অন্যদিকে একজন কোনো ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে প্রতিবেশীদের এমনকি গোটা দেশের জন্য সংকটের সৃষ্টি হয়।

তবে কিছু উন্নত দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানেরও ভূমিকা রয়েছে। তার একটি উদাহরণ হলো জাপান, যেখানে সরকারি সর্বজনীন বীমার অধীনে একজন নাগরিক গণ এবং ব্যক্তি উভয়খাতের প্রতিষ্ঠানেই চিকিৎসা নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের ভূমিকা আরও ব্যাপক, বলা যেতে পারে প্রধান। তবে জাপানের মতো যুক্তরাষ্ট্রে সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা নেই। বস্তুত নাগরিকদের একটি বড় অংশের কোনো বীমাই নেই। চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাদেরকে হয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহের দাতব্য অংশের স্মরণাপন্ন হতে হয় কিংবা অনেক সময় সর্বস্বান্ত হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের বড় একটি অংশের বীমা তাদের নিয়োজনের সূত্রে প্রাপ্ত। তবে এসব বীমার মধ্যে নানান ধরনের আবির্ভাব ঘটেছে। সবশেষে রয়েছে দরিদ্র এবং বৃদ্ধদের জন্য পৃথক (প্রায় সর্বজনীন) বীমা ব্যবস্থা। সাধারণভাবে, যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাখাতের এই জটিল অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা দক্ষ বলে পরিগণিত হয় না। তার একটি প্রমাণ হলো, যেখানে (২০২৪ সালে) অন্যান্য উন্নত দেশের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হয় জিডিপির আনুমানিক

৬.৫ শতাংশ, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যয় হয় জিডিপির আনুমানিক ১৪ শতাংশ। অথচ, ২০২৪ সালে ইউরোপে গড় আয়ু ছিল ৮১.৬ বছর, পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রে তা ছিল ৭৯.০ বছর।

যাহোক, শিক্ষার মতো বাংলাদেশের চিকিৎসাতেও ব্যক্তিখাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে এবং তাকে অন্তর্ভুক্ত করেই একীভূত চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হবে জাপানের মতো সর্বজনীন বীমা ব্যবস্থা। তবে যেহেতু বাংলাদেশে এখনোও মাত্র এক শতাংশ পরিবার আয়কর প্রদান করে থাকেন, এবং নিয়োজনের সামান্য অংশই প্রাতিষ্ঠানিক, সেহেতু এখানে সহসা সে ধরনের বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা কঠিন। যতদিন পর্যন্ত তা না হচ্ছে, ততদিন চিকিৎসা সেবাকে গণখাতের সর্বজনীন সুযোগ হিসেবেই বিবেচনা করা শ্রেয় হবে। সেজন্য সরকারি খাতে পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক মানের চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করতে হবে। উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সসমূহকে এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতাল ও ক্লিনিক গড়ে তুলতে হবে। একীভূত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জেলা শহরে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও চিকিৎসালয় গড়ে তোলার কর্মসূচিসমূহকে আগের অনুচ্ছেদে আলোচিত জেলা সহরসমূহকে স্বস্থানে নগরায়নের "হাব" হিসেবে গড়ে তোলার বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভাবা যেতে পারে।

৭.১.৫ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে অনুভূমিক বিভক্তি নিরসনে করণীয়

সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে ধনী-গরিবের মধ্যকার বর্তমান বিভক্তি নিরসনের জন্যও সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। তবে তার জন্য প্রথমে দরকার হবে নিয়োজন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধনকরণ। এর ফলে শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যেও প্রয়োজনীয় অগ্রগতি অর্জিত হবে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে কর-অনুদান ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। সেলক্ষ্যে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন না করে সর্বজনীন বীমা ব্যবস্থা চালু ও সফল করা কঠিন হবে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারও দ্বাদশ নির্বাচনের আগে সর্বজনীন বীমা ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেটা মূলত সরকারি ও আধা-সরকারী সংস্থাসমূহের কর্মীদের অনেকটা জোর করে তাদের ইতিমধ্যে বিরাজমান পেনশন ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে নতুন ব্যবস্থায় যোগ দেওয়ানোর প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা (যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা) প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কাজেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধনকরণ এবং শ্রমের আনুষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অগ্রগতি অর্জন না করে সর্বজনীন বীমা ব্যবস্থা চালু করা কঠিন হবে। অন্তর্বর্তীকালীন কিছু ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে নেওয়া যেতে পারে; তবে সেগুলোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং সেগুলোর দ্বারা দূরবর্তী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া ঠিক হবে না।

৭.১.৪ উল্লম্বিক বিভক্তি নিরসনে করণীয়

ধর্মের ভিত্তিতে উল্লম্বিক রাজনৈতিক বিভক্তি প্রশমনের শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা। সেলক্ষ্যে সংবিধানের "ধর্ম-নিরপেক্ষতা"র মূল নীতি পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। সুরা আল-কাফিরুনে পরিষ্কার বলা আছে, "লাকুম দিনিকুম ওয়ালিয়া দ্বীন," অর্থাৎ, যার-যার ধর্ম তার-তার কাছে"। কোরানের এই আদেশ মেনে চললেই বাংলাদেশে বিদ্যমান ধর্মীর বিভক্তি প্রশমিত হবে এই বিভক্তির বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিফল থেকে দেশ মুক্তি পাবে।

নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভূত সামাজিক বিভক্তি প্রশমনের জন্য ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি"র স্বাক্ষরিত চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ষাটের দশকে পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ এবং তার ফলে সৃষ্ট কাপ্তাই হ্রদের মাধ্যমে চাকমাদের উদ্বাস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। আশীর দশকে সূচনাকৃত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলী বাঙ্গালীদের অভিবাসিত করার নীতি অনুসরণের ফলে সেখানে পাহাড়িরা এখন সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এই অনভিপ্রেত পরিণতির সম্মুখীন হয়েও তাঁরা ১৯৯৭ সালের "শান্তি-চুক্তি" স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু এই চুক্তি অনুযায়ী "ভূমি-সমস্যা" যেভাবে নিরসিত হওয়ার কথা ছিল, তা হয় নি। কাজেই নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে উল্লম্বিক বিভক্তির সামাধানের জন্য এই "ভূমি-সমস্যা" সমাধানের জন্য আশু, আন্তরিক, এবং জোরালো প্রয়াস প্রয়োজন।

সামাজিক সংহতি পুনরুদ্ধার বিষয়ে দশ করণীয়'র এসব বিশ্লেষণ ও সুপারিশের আলোকে আমরা এখন এ বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের দিকে নজর দিতে পারি।

৭.২ সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি সম্পর্কে বিএনপির ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি

সামাজিক সংহতির বিষয়টি বিএনপির ইশতেহারের পাঁচটি ভাগের "ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, ও সংহতি" শীর্ষক সর্বশেষ ভাগে স্থান পায়। তবে অনুভূমিক বিভক্তি সম্পর্কে তাতে কোনো অনুধাবনের স্বাক্ষর এবং প্রশমনের লক্ষ্যে কর্মসূচির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে (প্রথম অনুচ্ছেদে) অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে আমরা বিএনপির যে অবহেলার পরিচয় পেয়েছিলাম, তার আলোকে এটা হয়তো আশ্চর্য্যের নয়। তবে "বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন" শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগে "শিক্ষা, মানবসম্পদ, ও স্বাস্থ্যসেবা" শীর্ষক উপভাগে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বেশ কিছু কর্মসূচির কথা বিএনপির ইশতেহারে উল্লেখিত হয়। "শিক্ষা ও মানবসম্পদ" বিষয়ে উল্লেখিত কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

- *বাজেট ও অবকাঠামো:* শিক্ষাখাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপির ৫% বরাদ্দ; ফ্রী ওয়াই-ফাই, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, ও ওয়ান টিচার ওয়ান ট্যাব; মিড-ডে মিল চালু; পরিচ্ছন্ন টয়লেট ও নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ভেন্ডিং মেশিন;
- *প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা:* বিনামূল্যে স্কুল-ড্রেস প্রদান ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার; বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষা এবং ওয়ান চাইল্ড-ওয়ান ট্রি কার্যক্রম; ক্রীড়া, দেশীয় সংস্কৃতি, ও সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে গুরুত্ব;
- *উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা:* ইনোভেশন গ্রান্ট; স্টুডেন্ট লোন; এবং বিদেশে উচ্চশিক্ষায় সহায়তা; বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে করমুক্ত রাখা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন; ইন্টার্নশীপ ও ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া কোলাবরেশন বৃদ্ধি;
- *মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা:* মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও কওমী সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন; ক্বারী ও আলেমদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও চাকরিতে অগ্রাধিকার; সবার জন্য কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;

- *শিক্ষক ও সংস্কার:* সার্বিক মানোন্নয়নে "শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন"; "কারিকুলাম পর্যালোচনা এবং সংস্কার করা হবে; মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ; অবসর ভাতা সহজীকরণ, রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান; গণ-অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা;

এসব কর্মসূচির কোনো সামগ্রিক লক্ষ্য কিংবা কাঠামো লক্ষ করা যায় না; বরং অনেকটা ছড়া-গুলির মতো মনে হয়। তবে, একীভূত, বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক লক্ষ্যে প্রণীত না হলেও এসব কর্মসূচির অনেকগুলি স্বগুণে ভাল। অবশ্য বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। যেমন, "বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষা"। যখন দেশে ভাল করে ইংরেজি এমনকি বাংলা ভাষাই শিক্ষা দেওয়া যাচ্ছে না, সেখানে হঠাৎ বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাবের পেছনের যুক্তি বোঝা কঠিন। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সেটা একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা-অভিমুখী হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে সেটা শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান বিভক্তি এবং বিচ্ছিন্নকরণকে (ghettoization) আরও প্রকট করবে এবং তা দেশের জন্য উপকারী হবে না।

"স্বাস্থ্য সেবা" শিরোনামে যেসব কর্মসূচির উল্লেখ করা হয় তারমধ্যে রয়েছে:

- বাজেট ও অবকাঠামো: স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ: পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় বাজেটের বরাদ্দ জিডিপির অন্তত ৫ শতাংশে উন্নীত করা
- দুর্নীতিমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা ও ই-হেলথ কার্ড প্রদান করা: জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যেমে প্রতিটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা
- স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ: দেশজুড়ে এক লক্ষ নতুন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে, যার মধ্যে ৪০ শতাংশ নারী;
- মহানগর ও জেলা শহরে স্বাস্থ্যসেবা: সকল মহানগর ও জেলা শহরে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা
- রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা: গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী শিশু ও বয়স্কদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান
- মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা: উপজেলা পর্যায়ে নিরাপদ প্রসবসহ আধুনিক মাতৃত্বকালীন ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা;
- প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ: সরকারি সহায়তায় বেসরকারি হাসপাতালে ক্যান্সার হার্ট ফেইলারের মতো জটিল রোগের সুলভ চিকিৎসা;
- ঔষধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহের নেটওয়ার্ক: প্রয়োজনীয় ঔষধের দাম কমানো এবং বিনামূল্যে প্রাথমিক ঔষধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ নিশ্চিত করা
- মশাবাহিত রোগ নির্মূল: বিজ্ঞানভিত্তিক মশা নিধন কার্যক্রমের মাধ্যমে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ও চিকনগুনিয়া প্রতিরোধ

এসব কর্মসূচির অনেকগুলিই ভাল। তবে প্রথমত, এগুলোরও কোন সামগ্রিক লক্ষ্য কিংবা কাঠামো লক্ষ করা যায় না; বরং অনেকটা ছড়া-গুলির মতো মনে হয়। অবশ্য, একীভূত, বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রণীত না হলেও এসব কর্মসূচির অনেকগুলি স্বগুণে ভাল। তবে বেশ কিছু নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। যেমন, হেলথ কার্ড বা অন্যান্য কার্ডকে ধন্বন্তরি ঔষধ বলে ভাবার কারণ নেই। কার্ড কী করবে এবং কীভাবে করবে এবং যা করবে তা স্থায়ত্বশীল কিনা, সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। যেমন "এক লক্ষ নতুন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হবে" এই পরিসংখ্যানের ভিত্তি কী? এর বেশীও তো দরকার হতে পারে। বিশেষভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে "সরকারি সহায়তায় বেসরকারি হাসপাতালে ক্যান্সার হার্ট ফেইলারের মতো জটিল রোগের সুলভ চিকিৎসা"। এটা কেন সমর্থযোগ্য হবে? সরকারের যদি এ ধরণের সহায়তা করার সক্ষমতা থেকেই থাকে তবে বরং সরকারি খাতেই এই চিকিৎসা করা হবে না কেন?

বিএনপির ইশতেহারের এই অংশে উল্লম্বিক বিভক্তি সম্পর্কেও কিছু মনোযোগ লক্ষ করা যায়। যেমন "ধর্মীয় সম্প্রীতি" বিষয়ক উপভাগে নিম্নলিখিত ঘোষণা ও কর্মসূচি উল্লেখিত হয়:

- *জাতীয় পরিচয়:* ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার; বিভেদধীন বাংলাদেশি পরিচয়
- *ধর্মীয় স্বাধীনতা:* নির্বিঘ্নে ধর্ম পালন ও উৎসব পালনের নিশ্চয়তা
- *নিরাপত্তা:* সংখ্যালঘু ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জানমাল এবং উপাসনালয় রক্ষার কঠোর আইনি সুরক্ষা
- *ভাতা ও সম্মান:* ইমাম, মুয়াজ্জিনসহ সকল ধর্মীয় প্রধানকে মাসিক সম্মানী ও উৎসব ভাতা
- *বাজেট ও ব্যবস্থাপনা:* ধর্মীয় ট্রাস্টের বাজেট বৃদ্ধি, ইসলামী গবেষণা সম্প্রসারণ এবং সাশ্রয়ী হজ্জ ব্যবস্থাপনা
- *শিক্ষা:* মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণ

স্পষ্ট যে, বিএনপির উপর্যুক্ত কর্মসূচিতে ধর্মের ভিত্তিতে সামাজিক বিভক্তির মূল প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাওয়া হয়। লক্ষ করা হয় না যে, "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার" হওয়া কঠিন যদি সংবিধান অনুযায়ী "বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" হয় এবং সংবিধান একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বাণী দ্বারা শুরু হয়। বিএনপির ইশতেহারে বরং ইসলাম ধর্ম পালন ও চর্চার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক প্রণোদনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যদিও অন্যান্য ধর্মকেও স্বীকৃতি এবং কিছু পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়। কিন্তু এতে রাষ্ট্র সবার না করে মূলত মুসলমানদের করার স্পৃহা পরিলক্ষিত হয়। স্মরণযোগ্য যে, ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ সরকারও এই পথে হেঁটেছে। নিজেকে ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রমাণিত করার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছে, যার সর্বশেষ উদাহরণ ছিল দেশে ৫৬৪টি মডেল মসজিদের নির্মাণ। কিন্তু তার ফলে যে অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শের উপর ভিত্তি করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দুর্বল হয়েছে; অথচ যে ইসলামী শক্তিকে তিনি খুশি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি।

বিএনপির ধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মসূচির মধ্যে বিশেষ উদ্বেগের হলো "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণ"। এই কর্মসূচি সমাজের ধর্মীয় বিভক্তিকে হ্রাসের পরিবর্তে বরং আরও বাড়িয়ে তুলবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি দেশের জাতিগঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের

অভিজ্ঞতা এবং উদাহরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষ এই দেশে অভিবাসী হয়েছেন এবং এখনো হচ্ছেন। তাঁরা নিজেরা বহুলাংশে মন-মানসিকতার দিক থেকে উৎসদেশের রয়ে গেলেও তাদের সন্তানেরা যুক্তরাষ্ট্রের অভিন্ন পাবলিক-স্কুল ব্যবস্থায় ভর্তি হয় এবং ১২ বছর এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকার মধ্য দিয়ে তারা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি নতুন জাতির সদস্যতে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের নাগরিকেরা যদি শিশু অবস্থাতেই শিক্ষালাভের জন্য নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যায়, তাহলে সন্দেহ নেই যে, তাদের পক্ষে একটি অভিন্ন বাংলাদেশী সমাজের সদস্য হয়ে ওঠা কঠিন হবে এবং তা বাংলাদেশের সংহতিপূর্ণ জাতি গঠনের জন্য ক্ষতিকর হবে।

নৃতত্ত্বভিত্তিক বিভক্তি সম্পর্কে "পাহাড় ও সমতলের নৃগোষ্ঠী" শিরোনামায় বিএনপির ইশতেহারে যেসব কর্মসূচি উল্লেখিত হয়, সেগুলি নিম্নরূপ:

- *অধিকার ও নিরাপত্তা:* ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল নৃগোষ্ঠীর সাংবিধানিক সাংবিধানিক অধিকার এবং জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:
- *উন্নয়ন অধিদপ্তর:* ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় পৃথক "নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা
- *স্বাস্থ্য ও শিক্ষা:* পার্বত্য জেলা হাসপাতালগুলোর আধুনিকায়ন ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ
- *অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান:* ইকো-ট্যুরিজম, পাহাড়ি হস্তশিল্পে বিনিয়োগ এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা
- *পর্যটন:* বেসরকারি উদ্যোগে পার্বত্য অঞ্চলে "এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম জোন" গড়ে তোলা
- *সামাজিক সুরক্ষা:* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য শতভাগ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিশ্চিতকরণ

স্পষ্টতই, বিএনপির ইশতেহারে ধর্মীয় বিভক্তির মতো নৃতত্ত্বভিত্তিক বিভক্তির মূল দিকসমূহ এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন, বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকত্বের সংজ্ঞায় লেখা হয় যে, "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন"? এই সংজ্ঞা দ্বারা বাংলাদেশে ভিন্ন নৃতত্ত্বের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের এই বড় ত্রুটি ১৯৭২ সালেই সূচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এতকিছুর পরও বিএনপি এই ত্রুটি দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে বলে মনে হয় না।

তদুপরি, বিএনপির ইশতেহারের এই অংশের লেখকেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত বলেও মনে হয় না[58]। এর প্রতিফলন দেখা যায় ইশতেহারে প্রদত্ত পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর জন্য পৃথক "উন্নয়ন অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির মধ্যে। সুবিদিত যে, ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির অধীনে তিনটি পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, এবং বান্দরবন) প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং এই তিনটি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাসম্পন্ন "আঞ্চলিক পরিষদ"ও গঠিত হয়েছে। সুতরাং, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর জন্য পৃথক "উন্নয়ন অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন নেই। যেটা প্রয়োজন তা হলো এসব পরিষদকে কাগজে-কলমে যেসব এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে সেগুলো সমুন্নত রাখা এবং এখতিয়ার সংক্রান্ত যেসব ইস্যু অমীমাংসিত রয়ে গেছে, সেগুলো নিরসন করা। সবচেয়ে বড় কথা, পার্বত্য জনগণের সবচেয়ে

[58] পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য চমৎকার উৎস হলো রায়, রাজা দেবাশীষ (২০০৪)।

বড় যে ইস্যু, তথা ভূমি অধিকার, সে বিষয়ক প্রায় যে ২৫,০০০ বিরোধ রয়ে গেছে সেগুলোর আজও নিষ্পত্তি হয় নি। যে কমিশনের মাধ্যমে এই নিষ্পত্তি হওয়ার কথা সেই কমিশনের গঠন, কাজ করার সুযোগ, কার্যধারা ইত্যাদি বিষয়ে যেসব সমস্যা রয়ে গেছে সেগুলির বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে কোনো সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বিপরীতে, পার্বত্য অঞ্চলে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে ট্যুরিজমের বিকাশের প্রতি বেশ মনোযোগ দেওয়া হয়। সুবিদিত যে, এসব ট্যুরিজম জোন প্রতিষ্ঠার নামে পাহাড় জনগণের প্রথাগত মালিকানাধীন ভূমি আরও বেশী করে অধিগৃহীত এবং তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা আরও বিপন্ন হয়। ভূমি অধিকার বিষয়ক মৌলিক বিষয়কে অবহেলা করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য "শতভাগ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিশ্চিতকরণে"র প্রতিশ্রুতি ফাঁকা বলে প্রতিভাত হতে পারে।

৭.৩ সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি সম্পর্কে বিএনপির এযাবৎ গৃহীত পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা

উপরের বিশ্লেষণ দেখায় যে, সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির বিষয়ে বিএনপির সামগ্রিক এবং মৌলিক কোনো কর্মসূচি নেই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকার এ বিষয়ে মূলত একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। সেটা হলো "ধর্মীয় প্রধান"দের ভাতা প্রদানের কর্মসূচির সূচনা করেছে। এটা ভাল যে, এক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনের পাশাপাশি মন্দির ও গীর্জার উপাসনা পরিচালকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় বিভক্তি এবং ধর্মীয় বৈষম্যের মূল কারণসমূহ দূরীকরণের বিষয়ে বিএনপি কোনো পদক্ষেপ নিবে বলে কোন আশ্বাস এ যাবত পাওয়া যায়নি। একইভাবে নৃতত্ত্ব ভিত্তিক যে বিভক্তি এবং বৈষম্য সেটার মূল কারণের বিষয়ে বিএনপির তেমন কোনো অনুধাবন এবং সম্ভাব্য উদ্যোগের বিষয়ে আশাবাদী হওয়ার ভিত্তি দেখা যায় না।

৮) নারী, শিশু, যুব, এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

সমাজের সকল সদস্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে কোনো কোনো পর্যায়ে কিছু অংশ তাদের বিশেষ পরিস্থিতি অথবা সে পর্যায়ে তাদের বিশেষ ভূমিকার জন্য অধিক মনোযোগের দাবি করে। বাংলাদেশের বর্তমান পর্যায়ে নারী, শিশু, যুব, এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান প্রয়োজন।

৮.১ নারীদের ভূমিকা এবং তাদের জন্য করণীয়

নারীরা দেশের অর্ধেক এবং দেশ গঠনে তাদের অবদান অসামান্য। দেশের আনুষ্ঠানিক শ্রমিকদের বড় অংশটি তাদের নিয়েই গঠিত। কিন্তু সে তুলনায় তাদের স্বীকৃতি কম এবং তাঁরা বিভিন্ন বঞ্চনা ও অবহেলার সম্মুখীন। অথচ তাদের সম্ভাবনা অপরিমেয়। তাদের চাহিদাসমূহ যথযথভাবে পূরিত হলে এই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হওয়া সুগম হবে এবং বাংলাদেশ বিপুলভাবে উপকৃত হবে। এক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন, তার মধ্যে রয়েছে

- নারীদের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন

- শিক্ষায় নারীদের পিছিয়ে পড়া প্রতিহত আরও অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ
- বাল্যবিবাহের অবসান
- সম্পত্তিতে নারীদের ন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠা
- মজুরির ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্যের অবসান
- ক্রীড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি বৈষম্যের অবসান
- কর্মজীবি মায়েদের জন্য সহজলভ্য শিশু-পরিচর্যা সেবা নিশ্চিতকরণ
- নারী নির্যাতন রোধ
- নারী পাচার রোধ
- রাজনীতি ও দেশ পরিচালনায় নারীদের ভূমিকা বৃদ্ধি
- নারী প্রগতির পক্ষে সামাজিক প্রচারাভিযান পরিচালনা

লক্ষণীয়, বিগত দশকগুলিতে নারীস্বাস্থ্যসেবার খাতে অগ্রগতি হলেও এখনো উন্নত দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশে প্রসবকালে মাতৃমৃত্যু হার প্রায় দশগুণ বেশী। নারীশিশুরা এখনো অবহেলার সম্মুখীন, যে কারণে তাদের একটি বড় অংশ ওজন-স্বল্পতায় ভোগে। বলাবাহুল্য, শ্রমজীবী-স্বল্পআয়ী পরিবারদের মধ্যেই এসব সমস্যা বেশী প্রকট। প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস এই পরিস্থিতির প্রতিকারে সহায়ক হবে; তবে অনেক প্রত্যক্ষ পদক্ষেপও প্রয়োজন। একইভাবে সপ্তম অনুচ্ছেদে আলোচিত একীভূত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা, এবং তার অংশ হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকসমূহের পুনরুজ্জীবন এবং শক্তিশালীকরণ অত্যন্ত জরুরী। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে আলোচিত নগরায়নের হাব-এন্ড-স্পোক মডেলের অধীনে জেলাশহরসমূহে বিশেষায়িত চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগের সৃষ্টিও এ লক্ষ্যে সহায়ক হবে।

বিগত দশকগুলিতে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে কিছু নেতিবাচক প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। যেমন, মাধ্যমিক পর্যায়ে কিশোরীদের ঝরে পড়ার হার এমনিতেই বেশী (২০১৭ সালে ৪২ শতাংশ) এবং তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উচ্চ-শিক্ষার পর্যায়েও নারীরা পিছিয়ে পড়ছেন; উচ্চ-আয়সম্পন্ন শ্রম বাজারেও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না; এবং গড় আয়ে তাঁরা পিছিয়ে থাকছেন। সুতরাং, মাধ্যমিক পর্যায়ে কিশোরীদের পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে কিশোরীদের পিছিয়ে পড়ার একটি সম্ভাব্য কারণ হলো বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি। ইউনিসেফের এক জরীপে দেখা যায় যে, বিবাহিত নারীদের মধ্যে ৫১ শতাংশের ১৮ বছর বয়সের আগেই (অর্থাৎ, অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালীন অবস্থায়) বিয়ে হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি অশুভ বংশানুক্রমিক অপুষ্টি চক্রেরও সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, এ বিষয়ে পদক্ষেপের প্রয়োজন।

নারী শ্রমিকেরা মজুরির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা যায় যে, একই ধরনের কাজের জন্য নারীদের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকদের মজুরি ২১ শতাংশ বেশী। তদুপরি, তারা বেশী ঘণ্টা কাজেরও সুযোগ পান। ফলে তাদের মোট আয় নারী সহকর্মীদের তুলনায় ৪০.৮ শতাংশ বেশী। এই পরিস্থিতি প্রতিকারের জন্য সমন্বিত বিভিন্নমুখী কর্মসূচি প্রয়োজন। কর্মজীবি নারীদের জন্য সহজলভ্য পর্যাপ্ত শিশু পরিচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে অন্যতম।

৮.২ শিশুদের জন্য করণীয়

শিশুদের জন্য যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, তার মধ্যে রয়েছে

- শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ
- সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
- শিশুদের পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ব্যবস্থা
- শিশুশ্রম হ্রাস এবং রোধ
- শিশু পাচার রোধ
- শিশুদের মধ্যে 'ইন্টারনেট আসক্তি' প্রতিরোধ
- শিশু সাহিত্য এবং শিশু-অভিমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উৎসাহিতকরণ

লক্ষণীয়, শিশুস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বিগতসময়কালে বেশ অগ্রগতি অর্জিত হলেও সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ে বেশ কিছু নেতিবাচক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যেমন ২০২২ সালে সম্পাদিত "বাংলাদেশ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য জরিপ" দেখায় যে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ওজন-স্বল্পতার হার ২০১৭/১৮ থেকে ২০২২ সালে পর্যন্ত ২২ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে এবং একই সময়ে বাংলাদেশের *ওয়েস্টিং*-এর হার ৮ শতাংশ থেকে বরং ১১ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বলাবাহুল্য, শিশুদের মধ্যে এই অপুষ্টির অভাবে স্বল্প আয়ের পরিবারদের সন্তানেরাই জন্য বেশী প্রযোজ্য। আশা করা যায় যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের হ্রাস এই অবস্থার প্রতিকারে সহায়ক হবে। তবে স্কুলে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর নাস্তা ও দুপুরের খাবার সরবরাহ, সকল শিশুকে পূর্ণাঙ্গ টিকাদান নিশ্চিতকরণ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিকসমূহের শক্তিশালীকরণসহ একীভূত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এক্ষেত্রে সহায়ক হবে। শিশুদের জন্য সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুশ্রমের প্রচলন এখনো ব্যাপক এবং অনেকক্ষেত্রে দারিদ্র্যের পাশাপাশি ভবিষ্যত জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ লাভের তাগিদ এক্ষেত্রে কারণ হিসেবে কাজ করছে। এসব বিবেচনায় নিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন।

৮.৩ যুবদের জন্য করণীয়

যুবসমাজের জন্য যেসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে:

- বাংলাদেশে জনমিতি "উপরপাওনা"র গতিপ্রকৃতি
- জনমিতি "উপরপাওনা"র সদ্ব্যবহারে ঘাটতি
- শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অভিমুখীনতা
- শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে সরকারের ভূমিকা
- যুব সমাজ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

- যুবসমাজ ও কায়িক শ্রম
- যুবসমাজের দৈহিক ও মানসিক গঠন

যুবসমাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি দুঃখজনক। একদিকে বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিগত "উপরিপাওনা" পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, যে হারে জনসংখ্যার নির্ভরশীল অংশের (তথা শিশু এবং বয়স্কদের) সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তারচেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মজীবিদের সংখ্যা। এটা সম্ভব হচ্ছে তরুণ এবং যুবদের বিপুল সংখ্যায় শ্রমশক্তি এবং শ্রমবাজারে যোগ দেওয়ার ফলে। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় যে, এই যুবদের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। ফলে তাদের একটি বড় অংশ বেকার থেকে যাচ্ছে। বেকারত্বের এই সমস্যা শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেশী তীব্র। এটা আরও বেশী অপচয়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা উত্তরণ এবং জনমিতি "উপরি-পাওনা" র পর্ব

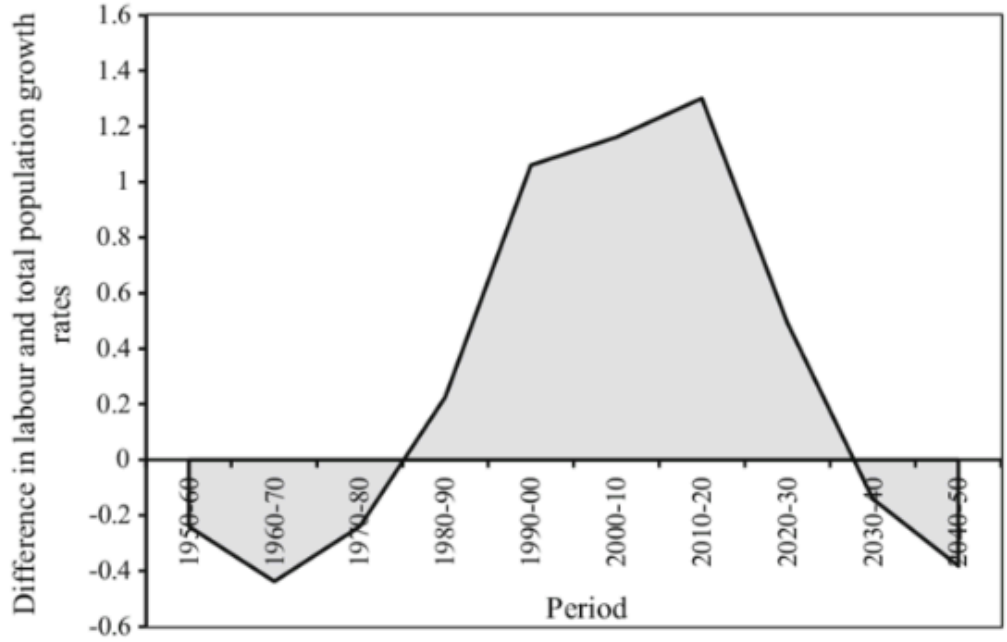

সূত্র: ইসলাম (২০২৫, পৃ. ৩২৬)

ঘনিষ্ট বিশ্লেষণ দেখায় যে, এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ হলো শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপযোগী অভিমুখিনতা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সাধারণ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮৬.৮ শতাংশ কলা ও মানবিক, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান, এবং ব্যবসা প্রশাসনে শিক্ষা লাভ করছে। পক্ষান্তরে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ৭.৭ শতাংশ এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তিতে মাত্র ১.৮ শতাংশ অধ্যয়নরত। মাধ্যমিক পর্যায়েও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগের অভাব প্রকট। পরিসংখ্যান দেখায় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের সংখ্যার এক-চতুর্থাশেরও কম। অথচ, উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের বর্তমান পর্যায়ে এই অনুপাত হওয়া উচিত ছিল বিপরীত। সুতরাং, অত্যন্ত জরুরী হলো বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতার ব্যাপক পরিবর্তন। অথচ, দেশের কর্ণধারেরা কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের কোন দায়িত্ব অনুভব করেন না। যেমন অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২১-২৫) বলা হয় যে, "*যুবদের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটানোর মতো সম্পদ সরকারের নেই* এবং সে কারণে দাতা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সমূহের সাথে অংশীদারির ভিত্তিতে কাজ করাই এ লক্ষ্য অর্জনের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল পন্থা (GoB 2020, পৃ. ৭০৫-৭০৬; লেখকের অনুবাদ ও গুরুত্ব আরোপ)"। দায়িত্ব অবহেলা করার এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত কমই হতে পারে।

সুতরাং, সামগ্রিকভাবে, দশ করণীয়র আলোচনা দেখায় যে, বাংলাদেশের যুবসমাজের সম্ভাবনার সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন। প্রথমত, একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে এবং ইংরেজি শিক্ষার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষা (প্রয়োজনে অষ্টম শ্রেণি)-র পর থেকে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক এবং সুলভ সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি খাতকেই এ বিষয় এমূল ভূমিকা পালন করতে হবে, যদি বেসরকারি খাতকেও প্রয়োজনীয় সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয়ত, উচ্চশিক্ষাকে বর্তমানের মানবিক, কলা, ও ব্যবসা প্রশাসন থেকে আরও বেশী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল অভিমুখী করতে হবে। এরূপ তিন ধারার সংস্কারই বাংলাদেশের যুব সমাজের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে পারে এবং দেশকে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে।

৮.৪ বয়স্কদের জন্য করণীয়

বাংলাদেশে গড় আয়ু ২০২৩ সালে ৭২.৩[59] বছরে পৌঁছায়। অর্থাৎ, জনসংখ্যায় বৃদ্ধদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তাদের সম্ভাবনা ও সমস্যা আরও বেশী মনোযোগ দাবি করে। প্রথমত, গড় আয়ু সংক্রান্ত পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে দেশের সরকারী এবং আনুষ্ঠানিক খাতে অবসর গ্রহণের বয়স পুনর্বিবেচনা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এই বয়স ৫৫ রয়ে গেছে। এটাকে বাড়িয়ে ৬০ কিংবা ৬৫ করার কথা ভাবতে হবে। ব্যক্তিখাতের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা উৎসাহিত করতে হবে। একটি কথা উঠবে যে, অবসরের বয়স বাড়ালে তা যুবদের জন্য চাকরির সুযোগ কমাবে কিনা। এ ধরণের সমস্যা যাতে না হয় সেজন্য অর্থনীতিতে মোট নিয়োজনের সুযোগ প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, অনেকে হয়তো অধিক বয়সে শুধু স্বেচ্ছামূলক কাজে নিয়োজিত হতে ইচ্ছুক হবেন। তাদের এই চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি ক্ষেত্র বিশেষ উপযোগী হতে পারে। একটি হলো শিশু এবং কিশোরদের পরিচর্যা। বয়স্ক মহিলারা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে নিয়োজিত হতে পারেন। একইভাবে বয়স্ক পুরুষেরা কিশোরদের খেলাধুলা এবং অন্যান্য ক্লাব কিংবা প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে। এলক্ষ্যে সামাজিক প্রচার ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এরূপ আরেকটি ক্ষেত্র হলো পরিবেশ রক্ষা। বয়স্করা পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন কাজের সাথে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে যোগ দিতে পারেন।

[59] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৪শে মার্চ, ২০২৪

বয়স্কদের স্বাস্থ্যসেবার দিকে মনোযোগ দেওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে। বয়সের সাথে চিকিৎসার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়া একটি স্বাভাবিক নিয়ম। সকল বয়স্করা যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সেলক্ষ্যে তাদের প্রাথমিক সেবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে কারণে তাহলে তাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়া এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন কম হবে। স্বাস্থ্যসেবার একত্রীকরণ সম্পর্কে সপ্তম পরিচ্ছেদে যেসব করণীয়র কথা আলোচিত হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন এক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি বয়স্কদের বিনোদন চাহিদা মেটানোর প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। সেজন্য পাড়া-মহল্লায় বয়স্কদের জন্য ক্লাব, পাঠাগার, ইত্যাদিক গড়ে তুলতে হবে। পর্যাপ্ত বিনোদনের সুযোগ বৃদ্ধদের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করবে।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হবে বৃদ্ধদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সেলক্ষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদে সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে কর্মসূচির কথা আলোচিত হয়েছে, তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হবে। এর ফলে কর্মসক্ষমতাকালীন সময়ে বৃদ্ধরা অর্থনীতি ও সমাজের জন্য যে অবদান্য রেখেছেন এবং আয় করেছেন তার সময়ান্তরিত পুনর্ভরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, কোন বদান্যতা হিসেবে নয়। এর ফলে বৃদ্ধদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদেরকে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়স্বজন, এবং বন্ধুবান্ধবের কৃপার উপর নির্ভর করতে হবে না।

সব মিলিয়ে আগামী বাংলাদেশে বৃদ্ধদের নতুন চোখে দেখতে হবে। দেশের নীতি ও কার্যক্রমে তাদের সংখ্যাগত গুরুত্বের যথাযথ প্রতিফলন থাকতে হবে। বৃদ্ধ, যুব, এবং শিশুদের সমবায়ে এবং নারী ও পুরুষ উভয় নিয়ে গঠিত একটি আনন্দময় সমাজের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

৮.৫ বিএনপির ইশতেহারে নারী, শিশু, যুব, এবং বয়স্কদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি

বিএনপির ইশতেহারে নারীদের লক্ষ করে গৃহীত বেশ কিছু কর্মসূচি "নারীদের ক্ষমতায়ন" শীর্ষক স্লাইডে [১২] এবং যুবদের লক্ষ করে গৃহীত অনেকগুলি কর্মসূচি "কর্মসংস্থান ও যুব উন্নয়ন" শীর্ষক স্লাইডে [১৪] সংকলিত হয়। তবে শিশু এবং বয়স্কদের বিষয়ে তেমনটা লক্ষ করা যায় না।

৮.৫.১ বিএনপির ইশতেহারে নারীদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি

ইশতেহারের "বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন" শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগে "নারীর ক্ষমতায়ন" উপ-ভাগে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয় যে, "বিএনপি বিশ্বাস করে, নারী অধিকার, মর্যাদা, ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় অর্জন সহজ হবে। বিএনপি নারীদের তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, ও সুরক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে সমাজে তাদের সম্পৃক্ততা এবং ক্ষমতাকে দৃঢ় করবে"। এটা ভাল এবং বিতর্কের কিছু নেই। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির তালিকা নিম্নরূপ [১২]:

- পরিবারের নারী প্রধানের নামে "ফ্যামিলি কার্ড" প্রদান;
- স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা;
- নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ;
- নীতিনির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
- প্রজনন ও মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বৃদ্ধি;
- লিঙ্গ-ভিত্তিক ও অনলাইন সহিংসতা, বিদ্বেষ, এবং বুলিং নিরোধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বাস্তবায়ন;
- ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশেষায়িত "নারী সাপোর্ট সেল" প্রতিষ্ঠা;
- নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও দক্ষতা সহায়তা প্রদান;
- আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে নারী কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
- কর্মস্থলে 'ডে-কেয়ার' ও 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার' স্থাপন;
- স্বাস্থ্য ও হাইজিনের জন্য ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন।

এছাড়া "শ্রমিক ও প্রবাসী কল্যাণ" শীর্ষক [১৭] নম্বর স্লাইডে উল্লেখিত হয় নিম্নরূপ আরও কয়েকটি কর্মসূচি:

- সমান মজুরি; নারী পুরুষ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বৈষম্যহীন বেতন নিশ্চিতকরণ [১৭]
- মাতৃত্বকালীন ছুটি; সকল নারী শ্রমিকদের সবেতন ৬ মাসের ছুটি [১৭]
- যৌন হয়রানি রোধে জিরো টলারেন্স এবং নিরাপদ আবাসন [১৭]

সুতরাং, নারীদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে বিএনপির ইশতেহারে অনেকগুলো কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে যেহেতু কোনো বিশ্লেষণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা অনুপস্থিত, সেহেতু এগুলো সম্যক ধারণা দ্বারা সমর্থিত কিনা তা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিএনপির তালিকায় উল্লেখিত হয় না। তার মধ্যে রয়েছে সম্পত্তিতে নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা; বাল্যবিবাহের অবসান, ইত্যাদি। তৃতীয়ত, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যকার আন্তসম্পর্ক নিয়েও সচেতনতার ঘাটতি দেখা যায়। যেমন, নারীদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার বিষয়টি তেমন মনোযোগ পায় নি। কিন্তু কিশোরীরা যদি মাধ্যমিক পর্যায়েই ঝরে পড়ে তাহলে বিনামূল্যে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ দিয়ে ততটা উপকার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এসব কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও নারীদের বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে তুলনামূলকভাবে ভাল মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

৮.৫.২ বিএনপির ইশতেহারে শিশুদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি

শিশুদের বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে একত্র করে কর্মসূচি দেওয়া হয় না। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে যেসব কর্মসূচির কথা উল্লেখিত হয় তার মধ্যে রয়েছে নিম্নরূপ:

- হতদরিদ্র এতিম শিশুদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন [১১]

- *মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা:* উপজেলা পর্যায়ে নিরাপদ প্রসবসহ আধুনিক মাতৃত্বকালীন ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা [১৫]
- গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী, শিশু, ও বয়স্কদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান [১৫]
- *শিশুশ্রম নির্মূল:* শিশুশ্রম পুরোপুরি বন্ধ করে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ [১৭]

এসব কর্মসূচি প্রশংসনীয়। তবে শিশুদের ন্যূনতম পুষ্টি নিশ্চিতের জন্য স্কুলে দুপুরের খাবার সরবরাহ; "পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের ব্যবস্থা" করা; শিশুদের মধ্যে 'ইন্টারনেট আসক্তি' প্রতিরোধ; শিশু সাহিত্য এবং শিশু-অভিমুখী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উৎসাহিতকরণ; ইত্যাদি এখানে অনুপস্থিত। তদুপরি, "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের দেশব্যাপী সম্প্রসারণের যে কর্মসূচি" ইশতেহারের অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা সমাজের ধর্মীয় বিভক্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

৮.৫.৩ বিএনপির ইশতেহারে যুবদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি

আগেই উল্লেখিত হয়েছে, বিএনপির ইশতেহারে যুবদের জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতির তালিকা দীর্ঘ। শুধুমাত্র, "কর্মসংস্থান ও যুব উন্নয়ন" শীর্ষক ১৪ নং স্লাইডেই পরিবেশিত হয়েছে ২২টি কর্মসূচি (সারণি)।

সারণি: বিএনপির ইশতেহারের ১৪ নং স্লাইডে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির তালিকা	
(১) জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালুকরণ (২) বেকারভাতা প্রদান (৩) বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও স্টার্ট-আপ ফান্ড এবং যুব দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান (৪) চাহিদাভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা (৫) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও ক্যারিয়ার সেন্টার; (৬) আইটি পার্কগুলোতে অফিস স্পেস ও ফ্রী ওয়াইফাই সুবিধা প্রদান; (৭) ফ্রীল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান; (৮) এসএমই ঋণ প্রদান ও অ্যামাজন ও আলিবাবায় সংযুক্তকরণ; (৯) মেধাভিত্তিক সরকারি নিয়োগ; (১০) তথ্য প্রযুক্তিতে নতুন শিল্প;	(১১) উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (১২) ট্যাক্স কাঠামো যৌক্তিক করা; (১৩) আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সুবিধা চালু; (১৪) প্রান্তিক জনগোষ্টির জন্য কর্মসংস্থান (১৫) অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সহযোগিতা (১৬) সমঅধিকার ও অন্তর্ভুক্তি (১৭) মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি (১৮) ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যারিয়ার পোর্টাল ও জব ম্যাচিং সেবা চালুকরণ (১৯) জাতীয় ডিজিটাল স্কিলস অথরিটি গঠন (২০) রপ্তানি খাতের বৈচিত্র (২১) উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ ও উদোক্তা সহায়তা (২২) ব্যবসা সহজ করার পরিবেশ
সূত্র: *সবার আগে বাংলাদেশ,* বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার, ২০২৬	

এখানে অনেক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেগুলো শুধু যুবদের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা নয়। তার মধ্যে রয়েছে যেমন (১) জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চালুকরণ; (২) বেকারভাতা প্রদান; (১১) উন্নয়ন

প্রকল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি; (১২) ট্যাক্স কাঠামো যৌক্তিক করা; (১৩) আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সুবিধা চালু; (১৪) প্রান্তিক জনগোষ্টির জন্য কর্মসংস্থান; (১৫) অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে সহযোগিতা; (১৬) সমঅধিকার ও অন্তর্ভুক্তি; (২০) রপ্তানি খাতের বৈচিত্র; এবং (২২) ব্যবসা সহজ করার পরিবেশ। কিছু আছে যেগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তি সংক্রান্ত এবং সেকারণে মূলত যুবদের অভিমুখীন বলে ভাবা যেতে পারে, কেননা তারাই এসব বিষয়ে বেশী পারদর্শী হবে বলে আশা করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: (৬) আইটি পার্কগুলোতে অফিস স্পেস ও ফ্রী ওয়াইফাই সুবিধা প্রদান; (৮) এসএমই ঋণ প্রদান ও অ্যামাজন ও আলিবাবায় সংযুক্তকরণ; (১০) তথ্য প্রযুক্তিতে নতুন শিল্প; (১৮) ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যারিয়ার পোর্টাল ও জব ম্যাচিং সেবা চালুকরণ; (১৯) জাতীয় ডিজিটাল স্কিলস অথরিটি গঠন; (২১) উদ্ভাবন, স্টার্ট-আপ ও উদোক্তা সহায়তা। আরো আছে (৯) মেধাভিত্তিক সরকারি নিয়োগ, যে দাবিতে ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের সূচনা হয়। সবশেষে আছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মসূচি: (৩) বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও স্টার্ট-আপ ফান্ড এবং যুব দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান; (৪) চাহিদাভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা; (৫) উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও ক্যারিয়ার সেন্টার; (৭) ফ্রীল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং (১৭) মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি।

যুবদের লক্ষ করে বিএনপির ইশতেহারের কর্মসূচির এই তালিকা ও তার শ্রেণীকরণ থেকে নিম্নরূপ গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতা ধরা পড়ে: শিক্ষা ব্যবস্থার অভিমুখীনতা পরিবর্তনের মৌলিক করণীয়টি এখানে প্রান্তিক ভূমিকা পায়। অথচ এটার হওয়া দরকার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ, প্রথমত, যুবদের মোট জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সেক্টরে কাজ করায় আগ্রহী হবে কিংবা প্রয়োজনীয় পারদর্শীতা অর্জন করবে। সুতরাং, শুধুমাত্র ডিজিটাল দক্ষতা অভিমুখী প্রশিক্ষণ এবং নিয়োজনের দিকে মনোযোগ বাংলাদেশের বর্তমান জনমিতিগত "উপরিপাওনা"র যথযথ ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত হবে না। দ্বিতীয়ত, ডিজিটাল কাজে নিয়োজিত হওয়ার জন্যও উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এ বিষয়ে তালিকায় আছে (৩) বিদেশি ভাষা শিক্ষা; (৪) চাহিদা ও যুগোপযোগী শিক্ষা; এবং (৭) ফ্রীল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান। কিন্তু এগুলো কোথায়, কীভাবে, এবং কার দ্বারা সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সবশেষে, আরও আছে (১৭) মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তির সুনির্দিষ্ট রূপ কী হবে, পরিধি কী হবে, শিক্ষার অন্যান্য স্রোতধারার সাথে এর সম্পর্ক কী হবে, সর্বোপরি কে এটার দায়িত্ব নিবে, ইত্যাদি কোনো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিরও প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্টকরণ উপস্থিত করা হয় না। ফলে এটা বহুলাংশে "কথার-কথা"ই থেকে যায়; বাস্তব তাৎপর্য থাকে না।

৮.৫.৪ বয়স্কদের জন্য বিএনপির কর্মসূচি

বয়স্কদের বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে একত্রিত কোন কর্মসূচিগুচ্ছের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বিক্ষিপ্তভাবে যে কয়েকটি কর্মসূচি উল্লেখিত হয় তার মধ্যে রয়েছে:

- পিতামাতার ভরণপোষণ আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন [সামাজিক সুরক্ষা, ১১]
- গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী, শিশু, ও বয়স্কদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা প্রদান [১৫]

এগুলো ভাল প্রস্তাব। তবে এতে বয়স্কদের কেবল "বোঝা" হিসবে গণ্য করার প্রবণতাই পরিস্ফুট হয়। তাদের সম্ভাবনা এবং তা বাস্তবায়নের কর্মপন্থা সম্পর্কে দশ করণীয়তে যেসব আলোচনা ও সুপারিশ করা হয়েছে তার প্রতিফলন পাওয়া যায় না। পিতামাতার ভরণপোষণ আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তবে এটাও অন্যের উপর নির্ভরতার ধারার একটি উদ্যোগ। বরং, যেটা প্রয়োজন তা হলো সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সূচনা করা এবং সেই লক্ষ্যে সকল নিয়োজন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনকরণ এবং সকল কর্মীদের ন্যূনতম আনুষ্ঠানিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করা। সেটা করা গেলে, কর-অনুদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলের কর্মকালীন বয়সের আয়ের ভিত্তিতে স্বীয় নিরাপত্তা তহবিল গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং তখন বৃদ্ধরা সকলে নিজেদের সঞ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করতে পারবেন এবং পরামুখাপেক্ষী হতে হবে না।

৮.৬ বিএনপি সরকার কর্তৃক স্বীয় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে এযাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মূল্যায়ন

নবগঠিত বিএনপি সরকার এখনো নারী, শিশু, যুব, এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয় নি। তবে পুরুষদের পরিবর্তে নারীদের নিকট "ফ্যামিলি কার্ড" বিতরণের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিবারে নারীদের বিশেষ ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের স্বাক্ষর রেখেছে। অন্যান্য বিষয়ে আমাদেরকে সরকারের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়টি শুধুমাত্র ইশতেহারে ঘোষিত ইতিমধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি (যেমন "ফ্যামিলি কার্ড" কিংবা "কৃষক কার্ড" বিতরণ) বাস্তবায়নে সীমাবদ্ধ নয়। বরং, বহু ক্ষেত্রে ইশতেহারে কেবল আকাংখা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচি সুনির্দিষ্ট করা হয় নি; অথবা করা হলেও তাতে অনেক সমস্যা রয়ে গেছে। ফলে, এসব ক্ষেত্রে কর্মসূচি নিয়েই পুনর্ভাবনা করতে হবে। ইতিপূর্বে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের বিষয়ে আমরা তার উদাহরণ দেখেছিলাম। যুবদের বিষয়েও আমরা তার দৃষ্টান্ত দেখি। পাঁচ-মিশেলী প্রকল্পের এক দীর্ঘ তালিকা পরিবেশিত হয়েছে ঠিকই; কিন্তু একটি স্বচ্ছ ধারণা ও পরিকৌশল তা থেকে বেড়িয়ে আসেনি। সুতরাং, প্রয়োজন হবে, যাকে বলে, ড্রয়িং বোর্ডে ফিরে যাওয়া, আরও গভীরভাবে চিন্তা করা, এবং তার ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ এবং আস্থা-উদ্রেককারী কর্মসূচিতে উপনীত হওয়া।

৯) সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন

দশ করণীয়র একটি ব্যতিক্রমী প্রস্তাব হলো তরুণদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করা। এটা ব্যতিক্রমী এই অর্থে যে, দশ করণীয়র বাকী করণীয়সমূহ বিভিন্নভাবে জাতীয় অঙ্গনে আলোচনার মধ্যে থাকলেও এই করণীয়টির এ যাবত খুব একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি, যদিও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের মতো দেশে এরূপ প্রশিক্ষণ চালু আছে। বাংলাদেশের নিকট প্রতিবেশী, শান্তিপ্রিয়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভূটানেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত।

৯.১ সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পেছনে যুক্তিগুলো নিম্নরূপ। প্রথমত, এটা দেশের তরুণদের শারীরিক ও মানসিক সুগঠনের জন্য উপকারী হবে। তাদের মধ্যে সততা, শৃঙ্খলা, কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধসহ জাতিগঠনের জন্য সহায়ক গুণাবলী বিস্তৃত করবে। দ্বিতীয়ত, এই কর্মসূচি দেশের সামাজিক সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। মুক্তিযুদ্ধ যেমন ধনী-দরিদ্র এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল তরুণকে একত্রিত করেছিল, তেমনি সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ সমাজের সকল অংশের তরুণদের একই ছাউনিতে সমবেত করবে, সম-অবস্থানে থেকে একে অপরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত করবে, এবং জাতীয় লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মনোভাব গড়ে তুলবে। প্রশিক্ষণ শেষে যখন তাঁরা নিজ নিজ অবস্থানে ফিরে যাবে তখনও সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণকালের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং তা বৃহত্তর সমাজে সংহতি বৃদ্ধি ও ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। তৃতীয়ত, এই কর্মসূচি বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীসমূহের সাথে দেশের জনগণের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করবে এবং তাকে স্থায়ী রূপ দিবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে দেশের সেনাবাহিনীর সাথে জনগণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এখন দেশের সামরিক বাহিনীসমূহ জনগণ থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন একটি অংশে পরিণত হয়েছে। চতুর্থত, এই কর্মসূচি দেশের তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভাগীদার হওয়াতে সহায়ক হবে এবং তা পরম্পরা ধরে তরুণদের চেতনায় মুক্তিযুদ্ধকে ধরে রাখতে সহায়ক হবে। পঞ্চমত, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ নিজেদেরকে ধীমান হওয়ার পাশাপাশি অস্ত্রধারী যোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণে পারদর্শী বলে প্রমাণ করেছিলেন। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন বাংলাদেশের জনগণের যোদ্ধা গুণ আরও দৃঢ় করবে এবং স্থায়ী চরিত্র দিবে। ষষ্ঠত, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার জন্য এই কর্মসূচি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে, কারণ বাংলাদেশের বিশেষ ভৌগলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে সনাতনী পদ্ধতির যুদ্ধ দ্বারা এদেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন।

৯.২ সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট রূপের ভিন্নতা

বাংলাদেশের জন্য অভিনব হলেও বিশ্বের নিরিখে এটা মোটেও অভিনব কর্মসূচি হয়। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের মতো দেশে এ ধরনের কর্মসূচি চালু আছে । এমনকি নিকট প্রতিবেশী, শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ ভূটানও এই নীতি অনুসরণ করে। তবে দেশভেদে এই কর্মসূচির সুনির্দিষ্ট রূপের ভিন্নতা দেখা পাওয়া যায়[60]। যেসব প্রশ্নে এই ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়, তার মধ্যে রয়েছে:

- প্রশিক্ষণের শুরু এবং শেষের বয়স;
- প্রশিক্ষণের সময়কাল;
- প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরও পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা;
- নারীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের প্রযোজ্যতা;
- প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ;
- প্রশিক্ষণের পর '*রিজার্ভিস্ট*' হিসেবে থাকার আবশ্যকতা; এবং

[60] *দশ করণীয়*তে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের নীতি অনুসারী দেশসমূহের তালিকা এবং এবং এই প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট দেশওয়ারী রূপ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।

- প্রশিক্ষণের সাথে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (*কনস্ক্রিপশান*) সম্পর্ক।

এসব বিষয়ে ঘনিষ্ট পর্যালোচনা থেকে যেটা বেড়িয়ে আসে তা হলো বাংলাদেশের জন্য সময়কাল হতে পারে নয় মাস এবং তা শুরু হতে পারে ১৮ বছর বয়সে। এই কর্মসূচির সর্বজনীনতা রক্ষার স্বার্থে দৈহিক এবং মানসিকভাবে উপযুক্তদের অব্যাহতি লাভের সুযোগ যথসম্ভব কম রাখাই ভাল। প্রথমে কেবল পুরুষদের নিয়েই এই কর্মসূচি শুরু করা যেতে পারে, এবং পরবর্তীতে নারীদের জন্য কিছুটা সংশোধিত কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে এবং তাতে যোগদান স্বেচ্ছাভিত্তিক রাখা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং *'রিজার্ভিস্ট'* হিসেবে থাকার আবশ্যকতা নেই বললেই চলে। বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (*কনস্ক্রিপশান*)-এর কোনো বিপরীত সম্পর্ক নেই; বরং এই কর্মসূচি প্রয়োজনে *কনস্ক্রিপশান*কে সুগম করবে।

৯.৩ সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার অর্থায়ন

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড দেখায় যে, ২০২০ সালে ১৮ বছর বয়সী পুরুষদের সংখ্যা ছিল ৭.৫ লাখ। ধরা যাক তারমধ্যে স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য কিছু সঙ্গত কারণে ০.৫ লাখ এই কর্মসূচির অধীনে অন্তর্ভুক্ত হতে অপারগ। সেক্ষেত্রে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হবে সর্বোচ্চ ৭ লাখ। যদি ৯ মাসের আহার, বাসস্থান, ইউনিফর্ম, অস্ত্রপাতির গোলাবারুদ, ইত্যাদির জন্য জনপ্রতি ১ লাখ টাকা প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে মোট প্রয়োজন হবে ৭,০০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের এখন বার্ষিক বাজেটের পরিমাণ প্রায় ৫ লাখ কোটি টাকা। সুতরাং, প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ৭,০০০ কোটি টাকা মোট বাজেটের ১.৪ শতাংশ হবে। এটা দেখায় যে, সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অর্থায়ন বড় সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এজন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অর্থ সামরিক খাতকে দেওয়া সম্ভব। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে এটা কার্যকর বিনিয়োগ বলে প্রমাণিত হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পিরামিড, ২০২০

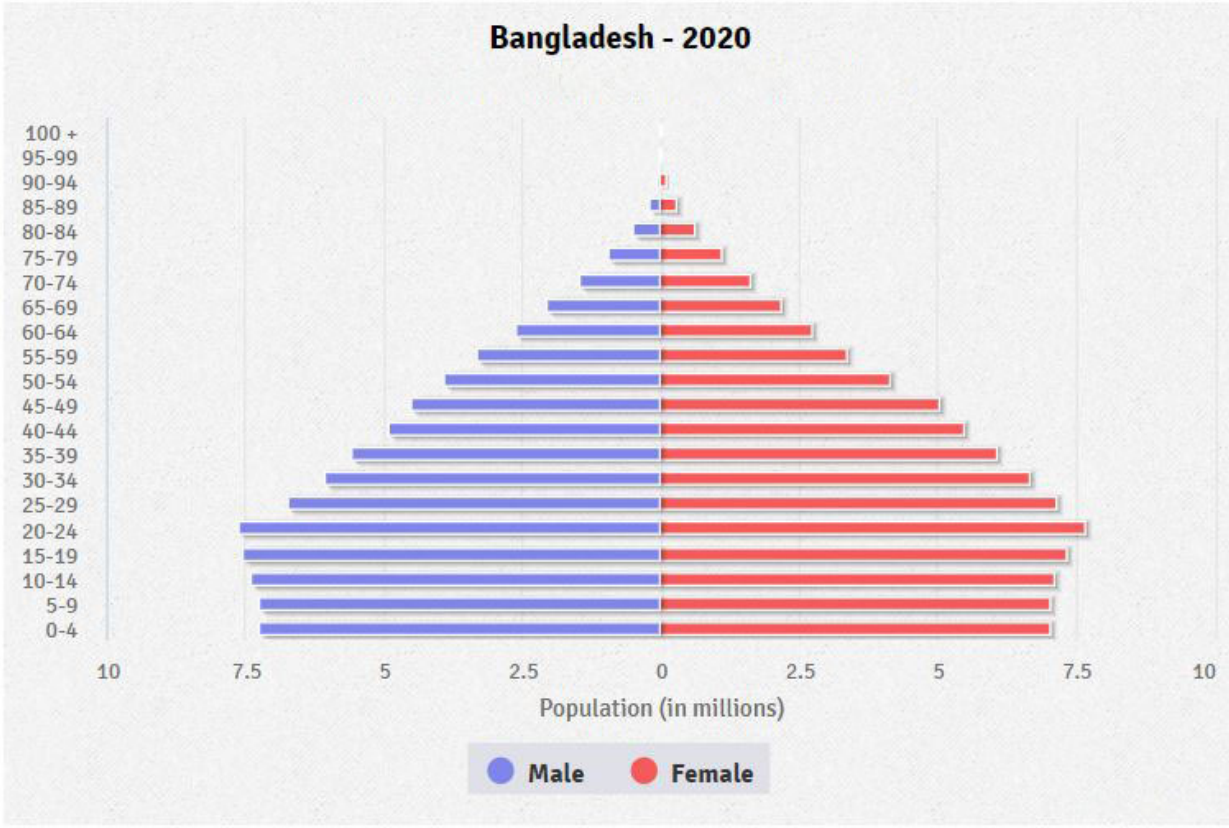

সূত্র: ইসলাম (২০২৫, পৃ. ৩৬০)

৯.৪ সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার লজিস্টিকস

অর্থায়ন সম্ভব হলেও এত বিরাট সংখ্যক যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়ার মতো ভৌত সক্ষমতার সৃষ্টি নিঃসন্দেহে একটি চ্যালেঞ্জ হবে, অন্তত স্বল্পমেয়াদে। সাম্প্রতিক তথ্যমতে, বাংলাদেশে ক্যান্টনমেন্টের সংখ্যা ৩০টি[61]। এগুলির আকৃতি এক নয়; কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট। প্রশিক্ষণ-উপযোগীদের সংখ্যা ৭ লাখ হলে প্রতি ক্যান্টনমেন্টের উপর গড়ে ২৩,০০০ যুবককে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হবে। এটা করার মতো ভৌত সামর্থ্য ক্যান্টনমেন্টসমূহের আছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য সামরিক বাহিনীই সবচেয়ে উপযুক্ত এবং তারাই এর উত্তর দিতে পারবেন। প্রথমাবস্থায় যদি এই বিরাট সংখ্যক যুবকদের থাকা, খাওয়া এবং প্রশিক্ষণ লাভের ভৌত সক্ষমতা না থাকে তবে প্রশিক্ষণের সময়কাল নয়মাসের পরিবর্তে তিন মাস করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি সেনানিবাসের জন্য প্রযোজ্য

[61] এগুলি হলো: (১) আলিকদম; (২) বান্দরবন; (৩) বগুড়া; (৪) চট্টগ্রাম; (৫) কুমিল্লা; (৬) ঢাকা; (৭) দীঘিনালা; (৮) মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হামিদ; (৯) হালিশহর; (১০) জাহানাবাদ; (১১) জাহাঙ্গীরাবাদ; (১২) জালালাবাদ; (১৩) যমুনা; (১৪) যশোর; (১৫) কাপ্তাই; (১৬) খাগড়াছড়ি; (১৭) খোলাহাতি (কালিহাতি?); (১৮) মিরপুর; (১৯) ময়মনসিংহ (২০) কাদিরাবাদ; (২১) রাজেন্দ্রপুর; (২২) রাজশাহী; (২৩) রামু; (২৪) রাঙ্গামাটি; (২৫) রংপুর; (২৬) সৈয়দপুর; (২৭) সাভার; (২৮) শহীদ সালাউদ্দিন; (২৯) শেখ হাসিনা; (৩০) শেখ রাসেল। সূত্র: https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cantonments_of_Bang

সংখ্যা হবে ৫,৮৩৩। আশা করা যায় যে, এটা বাস্তবায়নযোগ্য। প্রয়োজনবোধে, সেনানিবাসসমূহের বাইরে লভ্য প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী ভৌত কাঠামোও ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি তাতেও সংখ্যা অতিরিক্ত মনে হয় তাহলে সূচনাতে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে এই সংখ্যা আরও কমানো সম্ভব, এবং ভবিষ্যতে ক্রমে এই সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। এই লটারি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে। দ্রুতই ভৌত-সক্ষমতা বাড়িয়ে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য অর্জন করতে হবে যাতে এ বিষয়ে কোনো বৈষম্য স্থায়ী চরিত্র গ্রহণ না করে। বাংলায় কথা আছে, "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়"। যদি জাতি হিসবে আমরা এই কর্মসুচি গ্রহণ করি তাহলে নিশ্চয়ই এটা বাস্তবায়নের উপায় খুঁজে বের করা সম্ভব হবে।

৯.৫ প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিএনপির কর্মসূচি

বিএনপির ইশতেহারে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণের কোন কর্মসূচি নেই। তবে ইশতেহারের "বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন" শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগের "প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক ষষ্ঠ উপভাগে প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রথমে উল্লেখ করা হয় যে, "বিএনপি বিশ্বাস করে, সুশৃঙ্খল, রাজনীতিমুক্ত, ও যুগোপযোগী সক্ষমতায় গড়ে ওঠা প্রতিরক্ষা বাহিনীই কেবল দেশকে নিরাপদ রাখতে পারে। সশস্ত্র বাহিনী যেন উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে"। এই উপলব্ধি ও নীতি উল্লেখ করার পর এ সংক্রান্ত কর্মসূচির নিম্নরূপ তালিকা তুলে ধরা হয়:

- জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনা, নৌ, ও বিমান বাহিনীকে অত্যাধুনিক, ক্ষিপ্র, এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করে 'চতুর্মাত্রিক'[62] সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে;
- একটি শক্তিশালী, "ক্রেডিবল ডেটারেন্স" ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে, যাতে যেকোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যায়;
- সশস্ত্র বাহিনীকে সকল রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধে রেখে সম্পূর্ণ পেশাদার ও সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করা হবে;
- "বাংলাদেশ ফার্স্ট" নীতির ভিত্তিতে একটি নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল এবং আধুনিক "প্রতিরক্ষা ডকট্রিন" প্রণয়ন ও একটি "জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল" প্রতিষ্ঠা করা হবে;
- সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিমানবাহিনীর আধুনিকায়ন, এবং নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্লু-ইকনমির সর্বোচ্চ সুবিধা ও নৌপথ নিশ্চিত নিরাপদ রাখার প্রতি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান;
- সশস্ত্র বাহিনীর চাহিদা মেটাতে "মেইড ইন বাংলাদেশ' স্লোগানে স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা হবে;
- অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সমতা আনতে "ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন" নীতি কার্যকর করা হবে এবং রেশনসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা হবে;
- গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপযোগী সুদৃঢ় মিলিটারি-সিভিল রিলেশন স্থাপন করা হবে;
- সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবস্থান নেওয়া হবে।

[62] এ কথাটির ব্যাখ্যা থাকা ভাল ছিল।

প্রতিরক্ষা বিষয়ক এই কর্মসূচির তালিকায় নিঃসন্দেহে অনেক ভাল চিন্তা আছে। তারমধ্যে রয়েছে যেমন "ক্রেডিবল ডেটারেন্স;" "সশস্ত্র বাহিনীকে সকল রাজনৈতিক বিতর্কের ঊর্ধে রাখা;" অস্ত্রের চাহিদা মেটাতে "মেইড ইন বাংলাদেশ" নীতি অনুসরণ করা; অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের মধ্যে আর্থিক সমতা আনা; "গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপযোগী সুদৃঢ় মিলিটারি-সিভিল রিলেশন স্থাপন করা" এবং "সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অবস্থান নেওয়া"। ঘনিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলে দেখা যাবে যে, "সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা" এগুলোর প্রায় প্রতিটির জন্য আবশ্যক কিংবা অন্তত অনুকূল।

প্রথমত, "ক্রেডিবল ডেটারেন্স" ("বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধক")-এর বিষয়ে লক্ষ করা যেতে পারে যে, কেবলমাত্র কোটি কোটি সশস্ত্র সংগামে প্রশিক্ষিত এবং গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনায় সক্ষম জনগণের উপস্থিতিই বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার জন্য "বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধক" হতে পারবে। কয়েক লক্ষ পেশাদার সৈন্য দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে "বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধক" নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আধুনিক অস্ত্রের সমাহারের প্রতিযোগিতায়ওঃ বাংলাদেশের পক্ষে সফল হওয়া কঠিন। পর্যবেক্ষকদের মতে প্রতিরক্ষা ক্রয়ে দুর্নীতির প্রকোপ বেশী। ফলে বড় বড় অস্ত্র কেনার দিকে মনোযোগী হলে হয়তো মুষ্ঠিমেয় লোকজন ধনী হবে; কিন্তু প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে না।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতে শিল্প সক্ষমতার সম্ভাব্য যে মাত্রা হবে তাতে অত্যাধুনিক ট্যাংক, যুদ্ধবিমান ইত্যাদি নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় "মেইড ইন বাংলাদেশ" নীতির প্রয়োগ কঠিন হবে। বরং সর্বজনীন সামরিক শিক্ষা নির্ভর যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, তাতে এই নীতির প্রয়োগ সুগম হবে, কারণ এই ব্যবস্থার অধীনে মূল অস্ত্র হবে কালাশনিকভ রাইফেল, হস্তচালিত গ্রেনেড লঞ্চার, এবং ড্রোন (যেটা স্বল্পআয়ী ও দুর্বলের জন্য অত্যন্ত কার্যকর অস্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে), ইত্যাদি, এবং এগুলোর উৎপাদন বাংলাদেশের শিল্প-ক্ষমতার আয়ত্ত্বের মধ্যে থাকবে।

তৃতীয়ত, "গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপযোগী সুদৃঢ় মিলিটারি-সিভিল রিলেশন স্থাপন করা"র যে লক্ষ্য সেটার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অত্যন্ত উপযোগী। বিপরীতে, শুধুমাত্র পেশাদার সৈনিকদের দ্বারা গঠিত সামরিক বাহিনী দিনদিন সাধারণ জনগণ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তাদের ঘাঁটিগুলোতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ; তাদের অফিসারদের অনেকেই গলফ খেলা এবং ইংরেজিতে কথা বলাকে মানানসই আচরণ বলে মনে করেন। দেশের অর্থনীতিতে তাঁদের ভূমিকা মূলত ঠিকাদারি কর্মকান্ডে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সীমাবদ্ধ। সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে পুনরায় জনগণের বাহিনীতে রূপান্তরিত হতে সহায়ক হবে, যেমনটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়।

চতুর্থত, সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সকলে বৃহত্তর অর্থে সামরিক বাহিনীর সদস্য হয়ে উঠলে এই বাহিনীকে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহার করা কঠিন হয়ে উঠবে। ফলে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতির বাইরে রাখার জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

কাজেই ত্রয়োদশ নির্বাচনের জন্য প্রণীত বিএনপির ইশতেহারে সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি না থাকতে পারে। এটা আশ্চর্য্যের নয়, কারণ বাংলাদেশের কোনো প্রণিধানযোগ্য রাজনৈতিক দলই এই কর্মসূচির কথা ভাবে নি এবং প্রস্তাব করে নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বিএনপি এই কর্মসূচির বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করবে না, এবং বিবেচনা শেষে তা গ্রহণ করবে না। তবে, এ ধরনের একটি কর্মসূচির জন্য জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন। সুতরাং, দেশের সকল রাজনৈতিক দলেরই এই কর্মসূচির নিয়ে ভাবা শুরু করা প্রয়োজন।

৯.৬ সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নবগঠিত সরকারের পদক্ষেপের মূল্যায়ন

যেহেতু, সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের কোন কর্মসূচি বিএনপি এখনো গ্রহণ করেনি, সেহেতু নবগঠিত সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ আশা করার ছিল না। তবে কিছু কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে যেগুলোর উপযোগিতা সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তারমধ্যে একটি হলো অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়। প্রায়শ, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানা ধরনের অস্ত্র কেনার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু উপরে আমরা লক্ষ করেছি যে, দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সনাতনী ধারার স্বল্পসংখ্যক পেশাদার সামরিক বাহিনী মূল নির্ভর হয়, তাহলে এক ধরনের অস্ত্র কেনার উপর দিতে এহবে। পক্ষান্তরে, যদি প্রতিরক্ষার জন্য মূল নির্ভর হয় সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোটা জনগণ, সেক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের অস্ত্রের প্রয়োজন হবে, যার অনেকগুলো হয়তো দেশেই উৎপাদন করা সম্ভব হবে। সুতরাং, সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের একটি উন্মুক্ত গণ-আলোচনা যত শীঘ্র অনুষ্ঠিত হয় ততোই বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

১০) জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি

একটি দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণ নির্ভর করে সে দেশের সম্পদের সঠিক ব্যবহারের উপর। বর্তমান বিশ্বায়িত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার কেবল অভ্যন্তরীণ নীতির উপর নির্ভর করে না; বরং বহুলাংশে তা নির্ভর করে বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসৃত বৈদেশিক নীতি উপর। বিষয়টির উপলব্ধির জন্য প্রথমেই বাংলাদেশের মূল জাতীয় সম্পদসমূহের প্রত্যয়ী দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

১০.১ বাংলাদেশের মূল জাতীয় সম্পদ এবং তা সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্টসমূহ

বাংলাদেশের মূল জাতীয় সম্পদসমূহকে নিম্নরূপে শ্রেণিভুক্তিকরণ করা যায়:

- জনসম্পদ
- ভূমি, নদনদী ও পানি সম্পদ
- তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ:
- ভৌগোলিক অবস্থান

ঘনিষ্ট পর্যবেক্ষণ দেখায় যে, বর্তমান বিশ্বায়িত পৃথিবীতে বাংলাদেশের উপর্যুক্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতির মূল বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যসমূহ হতে হবে নিম্নরূপ[63]:

- উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান
    - রপ্তানির সুযোগ অব্যাহত রাখা ও সম্প্রসারণ
    - বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বজায় রাখা ও সম্প্রসারণ
    - উন্নয়নের জন্য যথার্থ অর্থে মূল্যবান বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি প্রাপ্তি
- নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি -- সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়
    - বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রাসঙ্গিক দেশ ও জোটসমূহ হলো: মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ভারত, ইউরোপ, জাপান, আসিয়ান (মিয়ানমার)
- স্বচ্ছতা
- জনগণকে আস্থায় নেওয়া

১০.২ বিএনপির ইশতেহারে জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি

বিএনপির ইশতেহারের "বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন" শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগের "প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক ষষ্ঠ উপভাগে পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে দলের প্রতিশ্রুতিসমূহ দেওয়া হয়। প্রথমে ঘোষণা করা হয় যে, বিএনপির পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হলো "সবার আগে বাংলাদেশ"। "বন্ধু আছে, কিন্তু কোনো প্রভু নেই" – এই নীতির আলোকে সমতা ও আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। আরও বলা হয় যে, বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না এবং নিজের বিষয়েও হস্তক্ষেপ মেনে নিবে না। এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে নিম্নরূপ কর্মসূচির তালিকা উপস্থাপিত হয়:

- বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, এবং রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি এবং বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতে শ্রম ও অভিবাসন কূটনীতি জোরদার করা হবে;
- আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে নিয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা হবে;
- পদ্মা ও তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে;
- গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শক্তি এবং আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করা হবে;
- আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে সমতা, সহযোগিতা, ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ; সেই সম্পর্কের ভিত্তি হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া, যা আমাদের সম্মিলিত অগ্রগতি নিশ্চিত করবে;
- মুসলিম বিশ্বের সাথে একটি "কৌশলগত অংশীদারিত্ব" গড়ে তোলা হবে;

[63] বাংলাদেশের সম্পদের স্বরূপ এবং সেসবের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়*, পরিচ্ছেদ ১০।

- সার্ক (SAARC)-কে কার্যকর করা এবং আশিয়ান (ASEAN)-এর সদস্যপদ লাভে প্রচেষ্টা চালানো হবে;
- দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার মতো নতুন অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রসার;
- সীমান্তে হত্যা, পুশ-ইন, এবং চোরাচালান বন্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা হবে;
- ক্রীড়া, সংস্কৃতি, ও শিক্ষা বিনিময়ের মাধ্যমে 'সফট পাওয়ার' বাড়ানো হবে;
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসগুলোর জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে এবং প্রবাসীদের কল্যাণে সেবার মান উন্নয়ন করা হবে।

প্রথমত, কর্মসূচির এই তালিকা বেশ বিশদ এবং সামগ্রিক চরিত্রের। দ্বিতীয়ত, এতে ১০.১ উপ-অনুচ্ছেদে আলোচিত বৈদেশিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয় নীতিমালার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন, বিএনপির ইশতেহারের উপর্যুক্ত তালিকার প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ, এবং সপ্তম কর্মসূচি বৈদেশিক সম্পর্ককে দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে নির্ধারণ করার যে নীতি প্রস্তাবিত হয়েছে তার অনুবর্তী। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের উপর জোর দেওয়ার লক্ষ্যটিও যথার্থ। এটাকেও বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য একটি করণীয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, কারণ বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা দেশের অর্থনীতি এবং পরিবেশের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয়ত, সূচনাতে প্রদত্ত ঘোষণা যে, "'বন্ধু আছে, কিন্তু কোনো প্রভু নেই," তা "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নেই" নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ[64]। চতুর্থত, পদ্মা ও তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের লক্ষ্যটিও ভাল। তবে, ভাল লক্ষ্য ও কর্মসূচির উল্লেখই যথেষ্ট নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো কী সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তা অজর্নের চিন্তা করা হচ্ছে এবং সেসব লক্ষ্যে এযাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এ বিষয়ে কতটা আশাবাদের উদ্রেক করতে পারে।

১০.৩ বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে বিএনপির এ যাবত গৃহীত পদক্ষেপের মূল্যায়ন

১০.৩.১ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি এখন সবচেয়ে বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি, যার আনুষ্ঠানিক নাম BD-US Agreement on Reciprocal Trade (ART)। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদিও বিএনপির বর্তমান সরকার গঠিত হয়েছে এই চুক্তি স্বাক্ষরের এক সপ্তাহ পরে, একাধিক কারণে এই সরকারের পক্ষে এই চুক্তির সাথে সংশ্লিষ্টতা এড়ানো কঠিন।

প্রথমেই দেখা যাক এই চুক্তির ইতিহাস কী এবং এতে কী আছে। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৯.১ বিলিয়ন ডলার; পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের আমদানির পরিমাণ ছিল ২.৩ বিলিয়ন ডলার; ফলে সে বছর বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬.৮ বিলিয়ন ডলার। এর

[64] সুবিদিত যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এই কথাটিকে নিজের আত্মজীবনীমূলক বইয়ের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সকলেরই জানা যে, আইয়ুব খান মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে "প্রভু" বিবেচনা করেই দেশ শাসন করেছিলেন, মার্কিন নেতৃত্বে গঠিত সিয়েটো এবং সেন্টো জোটের অব্যাহত সদস্যপদ যার একটি কেবল সাক্ষ্য ছিল। সেজন্য এই কথাটি প্রায়শ "ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই না!" গোছের বলে প্রমাণিত হয়

ভিত্তিতে ২০২৫ সালের ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর ৩৭ শতাংশ পাল্টাপাল্টি শুল্ক চাপায়[65]। এই শুল্ক হ্রাসের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরু করে এবং বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু দাবি মেনে নিলে এই শুল্কের হার ২০ শতাংশে হ্রাস করা হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত ART অনুযায়ী, বাংলাদেশ কর্তৃক এই চুক্তির শর্তসমূহ অনুমোদন সাপেক্ষে শুল্ক হবে ১৯ শতাংশ, যেটা আগে সম্মত হারের চেয়ে মাত্র ১ শতাংশ কম। এদিকে MFN ভিত্তিক বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের রপ্তানির উপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আগে থেকেই বহাল আছে[66]। এখন ART'র অধীনে ১৯ শতাংশ যোগ হলে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত বাংলাদেশী পোশাক শিল্পের পণ্যের উপর মোট শুল্ক হার হবে ৩৪ শতাংশ। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর (বাংলাদেশ কর্তৃক আরোপিত) শুল্কের হার (রিবেট সমন্বয় করার পর) হলো মাত্র ২.২ এবং ART অনুযায়ী ভবিষ্যতে তা প্রায় শূন্যে নেমে আসবে[67]। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা এই বলে যে, যুক্তরাষ্ট্রের তুলা এবং মনুষ্যসৃষ্ট তন্তু দ্বারা উৎপাদিত বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির উপর পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপ করা হবে না। কিন্তু এগুলোর উপর যুক্তরাষ্ট্রের MFN হারের শুল্ক বহাল থাবে, এবং এই শুল্কের হার হলো ১৫ শতাংশ, যা বাংলাদেশ আরোপিত শুল্কের তুলনায় প্রায় ৭ গুণ বেশী।

শুল্কহারের এই বিশাল বৈষম্যের পাশাপাশি ART-তে যোগ হয়েছে বাংলাদেশের উপর বহু বাধ্যবাধকতা[68]। তারমধ্যে রয়েছে যেমন, যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানিতে অশুল্ক বাধা অপসারণ; কোটা আরোপ না করা; এবং যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এমন কিছু না করা; ইত্যাদি। আরও যেসব বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন প্রায় ৩৫০ কোটি ডলার মূল্যের ১৪টি বোয়িং বিমান কেনা; ১৫ বছর ধরে প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক বিলিয়ন ডলার মূল্যের জ্বালানি ক্রয়; বছরে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিভিন্ন কৃষিপণ্য ক্রয়; যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি পরিমাণে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়; ইত্যাদি। এছাড়া সরাসরি রাজনৈতিক চরিত্রেরও কিছু বাধ্যবাধকতা যোগ হয়েছে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের অপছন্দনীয় দেশসমূহ থেকে অস্ত্র, পারমাণবিক জ্বালানী ক্রয় না করা, ইত্যাদি।

---

[65] পাল্টাপাল্টি শুল্কহার নির্ণয়ে ট্রাম্প যে ফর্মুলা ব্যবহার করেন তা হলোঃ [(ঘাটতি/মোট আমদানি)*০.৫]। বাংলাদেশের জন্য এটা দাঁড়ায় [৬.৮/৯.১)*০.৫] = ৩৭.৪।

[66] MFN (Most Favored Nation) হলো একটি বিধান যার অধীনে একটি দেশ কোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক যে দেশকে সবচেয়ে অনুকূল সুবিধা দিয়েছে সেই একই সুবিধা বাকী সকল রপ্তানিকারক দেশকেও দিতে বাধ্য।

[67] ART অনুযায়ী এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত যুক্তরাষ্ট্রের ৪,৯২২ ধরনের পণ্য ১০ বছরের জন্য MFN সুবিধা পাবে (অর্থাৎ, শুল্কহার হবে ২.২ শতাংশ); এবং আরও ২,২১০ ধরনের পণ্য এই সুবিধা পাবে চুক্তি স্বাক্ষরের পঞ্চম বছরে শুরু হয়ে দশম বছর পর্যন্ত। চুক্তি অনুযায়ী আরও সাব্যস্ত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর বাংলাদেশের শুল্কের প্রায় ৫০ শতাংশ চুক্তি স্বাক্ষরের পরপরই হ্রাস করতে হবে; বাকিটা তারপর করতে হবে। মাত্র ৩২৬ ধরনের পণ্যের আমদানি শুল্কবহির্ভূত রাখা হয়, তবে বাংলাদেশে এগুলো আমদানির পরিমাণ সামান্য। শুল্কহার হ্রাসের কারণে সরকারের রাজস্ব প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের পণ্যের উপর শুল্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব ১৪,০০০ থেকে ৩০,০০০ কোটিতে বৃদ্ধি পাবে (দ্রষ্টব্য Rahman 2026)। ।

[68] বস্তুত, মোট ৩২ পৃষ্ঠার এই চুক্তিতে বাংলাদেশের করণীয়র তালিকা প্রদান করতে যেয়ে ১৩১ বার "shall" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ৬ বার। এ থেকেই বোঝা যায়, এই চুক্তি কত একপাক্ষিকআরও যোগ করা যেতে পারে যে, এই চুক্তিতে বাংলাদেশের করণীয়র তালিকা প্রদান করতে যেয়ে বাংলাদেশের জন্য "may" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৫আ বার, পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য তা হয়েছে ৮ বার (Rahman 2026)।

সুতরাং, সামগ্রিকভাবে BD-US ART এটি একটি অন্যায্য এবং অসম্মানজনক চুক্তি। বাংলাদেশের প্রতিবেশী অনেক উন্নয়নশীল দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র যেসব বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেগুলোর সাথে তুলনা করলেও এই অন্যায্যতা ও সম্মানজনকতা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪-২৫ সালে রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনের জন্য এই রপ্তানি মূল্যের (৯.১ বিলিয়ন ডলার) ৪১.১ শতাংশ (অর্থাৎ ৩.৭৪ বিলিয়ন ডলার) বাংলাদেশকে ব্যয় করতে হয়েছে বিভিন্ন কাঁচামাল ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান (মূলত চীন থেকে) আমদানি করার জন্য। ফলে, এই রপ্তানি থেকে বাংলাদেশের নেট আয় (মূল্য সংযোজন)-এর পরিমাণ ছিল ৫.৪ বিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণ আয়ের জন্য বাংলাদেশকে কী পরিমাণ মাশুল গুণতে হচ্ছে তার হিসাব করলে এই চুক্তির অন্যায্যতা সম্ভবত আরও পরিষ্কার হবে। সুতরাং, এই চুক্তির ফলে তৈরি পোশাক শিল্পপতিদের স্বার্থ হয়তো কিছুটা সংরক্ষিত হয়েছে; কিন্তু গোটা দেশের স্বার্থ কতোটা রক্ষা করা গেছে তা প্রশ্নের বিষয়।

বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু এই চুক্তি তাদের কর্তৃক (১৬ ফেব্রুয়ারি) সরকার গঠনের এক সপ্তাহ আগেই স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেহেতু এই চুক্তির দায়ভার তাদের উপর চাপানো ঠিক নয়। এই যুক্তির সমস্যা হলো যে, বাংলাদেশের পক্ষে যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করেছেন এবং চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন খলিলুর রহমান, যিনি অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন[69]। বলা হয়ে থাকে, ইতিপূর্বে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী মিয়ানমার সরকারের সাথে যুদ্ধরত রাখাইন প্রদেশে "মানবিক" সহায়তা পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে করিডোর প্রতিষ্ঠার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তবে, শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রধানের প্রবল বিরোধিতার কারণে তাতে সফল হন নাই। সুতরাং, খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে তিনি যেসব কাজ করেছেন (যার মধ্যে ৯ই ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত ART অন্যতম) বিএনপি এক অর্থে সেগুলোর উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছে। ফলে, এই চুক্তির দায়দায়িত্ব বিএনপি সরকারের পক্ষে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তদুপরি, এই চুক্তিতে বিধান রয়েছে যে, স্বাক্ষরের ষাট দিনের মধ্যে এই চুক্তি পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বিএনপি সরকারের কাছ থেকে এ ধরণের কোন চিন্তা কিংবা পদক্ষেপের এখন পর্যন্ত কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি।

সমস্যা হলো যে, ART চুক্তি সম্পর্কে বিএনপি সরকারের এই (মৌন) সম্মতি এই দলের ইশতেহারে প্রদত্ত বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উপরে আমরা দেখেছি, ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, "সমতা ও আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে," এবং বাংলাদেশ স্বীয় অভ্যন্তরীণ বিষয়ে "অন্য রাষ্ট্রের ... হস্তক্ষেপ মেনে নিবে না"। কিন্তু, ART, স্পষ্টতই, বাংলাদেশের জন্য সম্মানজনক নয় এবং এই চুক্তির বহু

[69] পত্রিকার খবর অনুযায়ী এই চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন (১) শেখ বশিরউদ্দিন, বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট বিষয়ক উপদেষ্টা; এবং (২) খলিলুর রহমান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। এছাড়া বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের (WTO বিষয়ক) অতিরিক্ত সচিব খাদিজা নাজনীন, দুজন যুগ্ম সচিব ফিরোজ উদ্দিন এবং মোস্তাফিজুর রহমান; ঊর্ধতন সহকারী সচিব শেখ শামসুল আরেফিন; এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কমিশনার রইস উদ্দিন খান।

ধারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সমার্থক। বিএনপির ইশতেহারে আরও উল্লেখিত হয়েছে যে, "গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শক্তি এবং আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করা হবে"। কিন্তু ART মেনে চলার অর্থ হবে কেবল একটি অংশীদার দেশের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য অংশীদার দেশের বিরূপতার সম্মুখীন হওয়া। বলাবাহুল্য, এটা কাম্য নয়।

১০.৩.২ বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে সামগ্রিক মন্তব্য

সুতরাং, জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নের স্বার্থে বৈদেশিক নীতির ব্যবহারের লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে নবগঠিত বিএনপি সরকারের এযাবত গৃহীত পদক্ষেপ তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। আগামীতে এক্ষেত্রে বিএনপি কী ধরনের ভূমিকা পালন করে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয়।

উপসংহার

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে গঠিত বিএনপি সরকারের কাছ থেকে জনগণের প্রত্যাশা ব্যাপক। ভোটারদের প্রায় ৫০ শতাংশ বিএনপির পক্ষে রায় দিয়েছে, যার ফলে বিএনপি সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে। একক শক্তিতে বিএনপি সংবিধানের সংশোধন পাশ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। এরপরও যদি বিএনপি দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারে তবে দোষ চাপানোর মতো অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া বিএনপির জন্য কঠিন হবে।

বিএনপি সরকার এখনো নবগঠিত। মাত্র কয়েকমাস হয়েছে সরকার ক্ষমতায়। সুতরাং, এই সরকারের সামগ্রিক সাফল্য কিংবা বিফলতা বিষয়ে চূড়ান্ত রায়ে পৌঁছানোর এখনোও সময় আসেনি। তবে আশান্বিত কিংবা আশাভঙ্গ হওয়ার মতো নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটেছে। উপরের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচনার ভিত্তিতে উপনীত উপসংহারসমূহকে নিম্নরূপে সংকলিত করা যেতে পারে।

১. অর্থনৈতিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখেছি যে, কোন সামগ্রিক লক্ষ্য গৃহীত হয় নি এবং এই লক্ষাভিমুখী এক গুচ্ছ সংগ্রন্থিত কর্মসূচিও প্রস্তাবিত হয় নি। প্রাথমিক আয় বিতরণকে অধিকতর সমতাধর্মী করতে পারে এ ধরনের কেবল দুটি কর্মসূচির সাক্ষাৎ পাওয়া পায়। একটি হলো মূল্যস্ফীতির সাথে মজুরির সূচকায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের সম্প্রসারণ। বিএনপি সরকার যদি মূল্যস্ফীতির সাথে মজুরির সূচকায়ন করতে সক্ষম হয় তবে সেটা একটা প্রণিধানযোগ্য সাফল্য হবে। তবে সরকার যে শ্রম আইন পাশ করেছে সেটা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের সম্প্রসারণের বিষয়ে বিএনপির আন্তরিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

আয় বৈষম্য গ্রাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিএনপি সরকারের বেশী মনোযোগ মনে হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের পুনর্বিতরণমূলক কর্মসূচির প্রতি। তারমধ্যে "ফ্যামিলি কার্ড" এবং "কৃষক কার্ডে"র ইতিমধ্যে সূচনা করা হয়েছে। আর কিছু কার্ড, যেমন "হেলথ কার্ডে"র শীঘ্র সূচনা করা হবে বলে বলা হচ্ছে। সাধারণভাবে এসব কর্মসূচি সমর্থনযোগ্য। তবে অনেক প্রশ্নেরও উদ্রেক করে। প্রথমত, শুধুমাত্র এ ধরনের পুনর্বিতরণ বাঞ্ছিতমাত্রায় আয়বৈষম্য হ্রাসে সক্ষম হবে না। দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি সামগ্রিক কর্মসূচির অংশ না হলে এগুলো অনেকটা "ছড়া গুলি"র মতো হবে এবং প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি সংক্রান্ত সমানুবর্তী কর্মসূচীর অনুপস্থিতিতে এসব পুনর্বিতরণমূলক কর্মসূচি উন্নয়নে ব্যয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত সংকোচনের সৃষ্টি করতে পারে।

সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারের সামগ্রিক কোন লক্ষ্য এবং সংগ্রন্থিত কর্মসূচি দেখা যায় না। কিছু পুনর্বিতরনমূলক কর্মসূচি দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের (অন্তত প্রধানমন্ত্রীর) সদিচ্ছার ইঙ্গিত বহন করে; তবে এই সদিচ্ছা একটি কার্যকর প্রয়াসে উত্তরিত হতে পারবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন

২. সুশাসন

২০১৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রত্যাশা ছিল সুশাসন, যেটা রাষ্ট্রসংস্কারের দাবির রূপে অভিপ্রকাশিত হয়েছিল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচিনের আগেই বিএনপি রাষ্ট্রসংস্কারের বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল এবং অন্তর্বর্তী সরকারে অধীনে এ বিষয়ে যে ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তার সোৎসাহী অংশীদার ছিল। এখন সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনের অধিকারী হওয়ার পর এ বিষয়ে সাফল্য প্রদর্শন করা বিএনপির জন্য অত্যাবশ্যক।

তবে এ বিষয়ে বিএনপির এ যাবত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তেমন আশার সঞ্চার করে না। বিশেষত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে প্রশ্নবিদ্ধ নিয়োগ এবং ব্যক্তিখাতের দেউলিয়া হওয়া এবং সরকারী অর্থে পুনঃপুঁজিভরণকৃত ব্যাংকসমূহের মালিকানা প্রাক্তন ঋণ-খেলাপি মালিকদের নিকট সহজ শর্তে ফেরত দেওয়ার বিধান-সম্বলিত "ব্যাংক রেজুল্যুশান আইনের" প্রণয়ন, ইত্যাদি প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়ে বিএনপি সরকারের অন্তরিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। একইভাবে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ সচিবালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উৎসাহের ঘাটতি, কিংবা অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক জারিকৃত রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশকে অনায়াসে এবং দ্রুততার সাথে আইনে রূপান্তরিত করা এবং তার মাধ্যমে সাংঘর্ষিক রাজনীতির প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির প্রতি বিএনপির আগ্রহের বিষয়েও প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। এসব প্রবণতা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে সুশাসন অর্জনের লক্ষ্য দূরবর্তীই থেকে যাবে।

৩. আনুপাতিক নির্বাচন

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রসংস্কারের আলোচনায় যে দুটি বিষয় নতুনত্ব সংযোজন করে তা হলো সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি এবং আনুপাতিক নির্বাচনের প্রবর্তন। দ্বাদশ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রসংস্কারের দাবির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে বিএনপি সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনসহ অন্য কিছু দাবি মেনে নিলেও আনুপাতিক

নির্বাচনের দাবি মেনে নেয় নি। উচ্চকক্ষকেও বিএনপি মূলত একটি অলংকারিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করেছে। সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাওয়ার ফলে অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক বিএনপির উপর কৌশল করে আনুপাতিক নির্বাচন ও ক্ষমতাশীল উচ্চকক্ষ চাপানোর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, বাংলাদেশে আনুপাতিক নির্বাচনের আশু প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা কঠিন। তবে রাষ্ট্রসংস্কারের লক্ষ্যে উত্থাপিত এ যাবত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে আনুপাতিক নির্বাচন প্রবর্তনের প্রস্তাবই সবচেয়ে মৌলিক। ফলে আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষাবলম্বীদের এখন যেটা করণীয় তা হলো জনগণের নিকট আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে আরও প্রচারাভিযান চালানো যাতে জনগণের এবং ভোটারদের মধ্যে আনুপাতিক নির্বাচনের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন গড়ে ওঠে। এছাড়া আনুপাতিক নির্বাচনকে কিছুটা দূরবর্তী প্রযোজ্যতাসাপেক্ষ করার কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

৪. পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

নবগঠিত সরকার, বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দেশের পরিবেশের সুরক্ষার প্রতি বেশ আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ২০,০০০ কিলোমিটার খাল খনন, ৫ কোটি বৃক্ষরোপণ, ইত্যাদি কর্মসূচির মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। তবে পরিবেশের সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা অনেক বিশাল এবং জটিল কাজ। সরকারকে এ বিষয়ে সম্যক উপলব্ধিতে পৌঁছাতে হবে। এরূপ উপলব্ধি এবং কর্মসূচি প্রণয়নে তার যথাযথ প্রতিফলন ছাড়া খালখনন ও বৃক্ষরোপণের মতো আপাতদৃষ্টিতে ভাল কর্মসূচিরও বিফল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, নদনদী বাংলাদেশের পরিবেশের মেরুদণ্ড। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিদেশী পরামর্শক ও ঋণদানকারি সংস্থাসমূহ নদনদীর প্রতি বাংলাদেশের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী "বেষ্টনী পন্থা" চাপিয়ে দেয়, যেখানে বাংলাদেশের প্রয়োজন হলো "উন্মুক্ত-পন্থা"। গত প্রায় সাত দশক ধরে এই ভ্রান্ত ধারার কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশের গোটা নদী ব্যবস্থা বিপর্যস্ত ও মূমুর্ষ। তার সাথে যোগ হয়েছে ভারত কর্তৃক অভিন্ন নদনদী থেকে পানি প্রত্যাহার। সুতরাং, বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার্থে সর্বাগ্রে করণীয় হলো "বেষ্টনী পন্থা" পরিত্যাগ করে "উন্মুক্ত-পন্থা"য় প্রত্যাবর্তন। বাংলাদেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিফলসমূহ মোকাবেলায় সাফল্যের জন্যও এই প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য।

বিএনপির ইশতেহারে এবং সরকারের এ যাবত কর্মকান্ডে এই মৌলিক উপলব্ধির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তার অভিপ্রকাশ দেখা যায় তিস্তা নদী সংক্রান্ত চীনা প্রকল্প এবং বাংলাদেশের নদী বিষয়ক কায়েমি স্বার্থ কর্তৃক প্রস্তাবিত গঙ্গা/পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের প্রতি এই সরকারের সমর্থনের মধ্যে। ফলে পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিফল মোকাবেলার বিষয়ে বিএনপি সরকারের অবস্থান বরং উদ্বেগের।

৫. গ্রাম সরকার/পরিষদ গঠন

বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে গ্রাম-পঞ্চায়েত নামক স্বশাসন সংস্থা ছিল। এই সংস্থা একদিকে গ্রামের অভ্যন্তরীণ জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং গ্রামবাসীদের যৌথ প্রয়াসের নেতৃত্ব দিয়েছে, এবং অন্যদিকে, উপরিস্থ শাসন কাঠামোর

সাথে গ্রামবাসীদের সম্পর্কের মধ্যস্থতা করেছে। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে অবহেলা ও বিমাতাসুলভ আচরণের কারণে এই প্রতিষ্ঠান বহুলাংশে হারিয়ে যায়। প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক সমবায় কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে গ্রামের স্বশাসন প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত ও আরও উঁচু পর্যায়ের ভূমিকার অধিকারী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আগস্টের অভ্যুত্থানের ফলে বঙ্গবন্ধুর সে প্রয়াস আর অগ্রসর হতে পারেনি। জিয়াউর রহমান তাঁর "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং অনেকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮১ সালের অভ্যুত্থানের ফলে সে প্রয়াসও অগ্রসর হতে পারেনি।

কিন্তু দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোকে গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। এর পেছনে মূল যুক্তি দুটি। প্রথমত, এর ফলে দেশের সরকার গ্রামাঞ্চলের জনগণের আরও কাছাকাছি পৌঁছাবে। তার ফলে একদিকে গ্রামবাসীদের কর্তৃক সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সেবা পাওয়া সুগম হবে। অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন লক্ষ্য এবং করণীয় সম্পাদনে গ্রামবাসীদের সহযোগিতা পাওয়া সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মূল সম্পদ হলো জমি-জল-জন। কিন্তু এসবের যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রায়শ যৌথ উদ্যোগ এবং প্রয়াসের প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের প্রয়াস ও উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাবে তা সংঘটিত হতে পারছে না। গ্রাম সরকার/পরিষদ গঠিত হলে এই অভাব পূরিত হবে এবং দেশে নীচ-থেকে-উপর অভিমুখী একটা সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সূচিত হবে যা দেশের উন্নয়নকে একটি গণমুখী চরিত্র দিতে সহায়ক হবে।

জিয়ার উত্তরসূরি হিসেবে বিএনপি এবং বিশেষত সরকার প্রধানের গ্রাম সরকার সম্পর্কে উৎসাহিত হওয়ার কথা। ত্রয়োদশ নির্বাচনের আগে ঘোষিত বিএনপির ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, "গ্রাম সরকারের প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে একে কার্যকর করা হবে, যাতে তৃণমূল পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়"। নবগঠিত সরকার এখনোও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তবে ইশতেহারে প্রদত্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আশা করা যে, এই সরকার এ বিষয়ে শীঘ্র উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তা করতে যেয়ে গ্রাম সরকার সংক্রান্ত প্রস্তাবনায় বিএনপি কী কী সংস্কার সাধন করবে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করবে দেশবাসী এখনো তা দেখার অপেক্ষায় আছে।

স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দীর বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে দেশ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি পরিবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল। সুতরাং, গ্রামের জন্য উপযোগী কাঠামো নির্ধারণে এসব পরিবর্তনের প্রতি নজর দিতে হবে[70]।

৬. আঞ্চলিক বৈষম্য এবং উন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণ

আঞ্চলিক বৈষম্য সহসা দূর হওয়ার মতো বিষয় নয়। এটাকে মধ্য কিংবা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর একটি বিশ্বাসযোগ্য পথরেখা থাকতে হবে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিএনপির ইশতেহার

[70] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য *দশ করণীয়*, পরিচ্ছেদ ৫।

তেমন উৎসাহিত করতে পারেনা। বিএনপির ইশতেহারের "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন" ভাগে অনেক কর্মসূচির তালিকা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সেগুলো সমন্বিত নয়। অনেক কর্মসূচির সাথে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যের স্পষ্ট সম্পর্ক নেই। সুতরাং, নবগঠিত বিএনপি সরকারের প্রয়োজন হবে, প্রথমত, "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নে"র একটি সুচিন্তিত ও সমন্বিত পরিকৌশল (*স্ট্র্যাটেজি*) নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া। সেলক্ষ্যে দশ করণীয়তে পরিবেশিত আলোচনা সহায়ক হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইশতেহারের "অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন" শীর্ষক ভাগে পরিবেশিত অনেক কর্মসূচি উদ্বেগের সৃষ্টি না করে পারে না। তার মধ্যে রয়েছে তিস্তা মহাপরিকল্পনা, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, এবং গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের সংস্কার কর্মসূচি। এসব প্রশ্নবিদ্ধ প্রকল্প নিয়ে কোনো দ্বিতীয় চিন্তার সুযোগ না রেখে এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক হবে।

৭. সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি

মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি সংহত সমাজ হিসেবে অভ্যুদিত হলেও ক্রমে দুই ধরনের বিভক্তি প্রকট হয়ে ওঠে এবং এই সংহতি দুর্বল হয়। এক ধরনের বিভক্তি হল অনুভূমিক (*হরাইজন্টাল*), যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক স্তরীকরণ। এর অভিঘাতে দেশের শিক্ষা ও চিকিৎসাব্যবস্থা ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অন্য ধরনের বিভক্তি হলো উল্লম্বিক (*ভার্টিক্যাল*), যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধর্ম ও নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্তি। অনুভূমিক বিভক্তি হ্রাসের লক্ষ্যে আয়-বৈষম্য হ্রাস করতে হবে এবং একীভূত শিক্ষা, চিকিৎসা, এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ধর্ম ও নৃতত্ত্বভিত্তিক বিভক্তি হ্রাসের জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে ১৯৭২ সালের রূপে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সেখানে নাগরিকত্বের সংজ্ঞায় বাঙ্গালীর পাশাপাশি অন্যান্য নৃতত্ত্বের জনগণের উপস্থিতিকে স্বীকার করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের সাথে সংঘাতের স্থায়ী অবসানের জন্য ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং বিশেষত ভূমি-অধিকার বিষয়ক বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি করতে হবে।

বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে সামাজিক সংহতির বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। বরং কিছু স্ববিরোধী বক্তব্যও স্থান পায়। "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার" নীতির কথা বলা হলেও এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পরিদৃষ্ট হয় না। একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে বরং "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণে"র প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙ্গালী সংঘাত নিরসনের বিষয়ে কার্যকর কর্মসূচির পরিবর্তে এমনসব কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয় যা সেখানকার পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধির ঘাটতিরই পরিচয় দেয়।

৮. নারী, শিশু, যুব ও বয়স্কদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ

বিএনপির ইশতেহারে নারী এবং যুবদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উভয়কে লক্ষ্য করেই এক গুচ্ছ কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে নারী বিষয়ক কর্মসূচির মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তারমধ্যে রয়েছে সম্পত্তিতে নারীদের অধিকার; মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে কিশোরীদের ঝড়ে পড়া, বাল্যবিবাহের বৃদ্ধি, এবং তাদের মধ্যে

অপুষ্টির প্রজন্মান্তর প্রসারণ; উচ্চশিক্ষা ও উচ্চআয়ের নিয়োজনে সীমিত উপস্থিতি, এবং নারীদের প্রতি সহিংসতা, ইত্যাদি।

বিএনপির ইশতেহারে যুবদের জন্য দাবীকৃত কর্মসূচির সংখ্যা আরও ব্যাপক। কিন্তু ঘনিষ্ট পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এসব কর্মসূচির অনেকগুলিই সাধারণ চরিত্রের এবং বিশেষভাবে যুবদের জন্য নয়। যুবদের লক্ষাভিমুখী কর্মসূচির অনেকগুলিই ডিজিটাল প্রশিক্ষণ এবং সেবা উৎপাদনমূলক। এসব কর্মসূচি যুবদের একটি অংশের জন্য আগ্রহের হলেও এক বিরাট অংশের জন্য ততো প্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলাদেশ জনমিতিক উপরিপাওনার পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশ এযাবৎ এই উপরিপাওনা থেকে তেমন সুফললাভ করতে পারেনি। বরং, দেশে শিক্ষিত বেকারত্বের প্রকট সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। এ অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নরূপ পরস্পর-সম্পর্কিত তিন ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রথমত, একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে এবং ইংরেজি শিক্ষার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার মানের উন্নতি ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, মাধ্যমিক শিক্ষা (প্রয়োজনে অষ্টম শ্রেণি)-র পর থেকে কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক এবং সুলভ সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সরকারি খাতকেই এ বিষয়ে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে; তবে বেসরকারি খাতকেও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে। তৃতীয়ত, উচ্চশিক্ষাকে বর্তমানের মানবিক, কলা, ও ব্যবসা প্রশাসন থেকে আরও বেশী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল অভিমুখী করতে হবে। বিএনপির ইশতেহারের যুব বিষয়ক পাঁচ-মিশেলী কর্মসূচির তালিকার পরিবর্তে এই তিনটি করণীয়র উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে নতুনভাবে কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

শিশুদের বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে বেশ কিছু ভাল কর্মসূচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার বিরাজমান সংকট সম্পর্কে উপলব্ধি এবং তা কাটিয়ে ওঠার উপায় সম্পর্কে তেমন সচেতনতা লক্ষ করা যায় না। বরং, "মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের দেশব্যাপী সম্প্রসারণে"র যে আরেকটি কর্মসূচি ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা সমাজের ধর্মীয় বিভক্তিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানের উন্নয়নের লক্ষ্যকে আরও দুরূহ করে দিবে বলেই ধারণা করা যায়।

বয়স্কদের বিষয়ে বিএনপির ইশতেহারে কয়েকটি ভাল কর্মসূচির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে তাতে বয়স্কদের কেবল "বোঝা" হিসবে গণ্য করার প্রবণতাই পরিস্ফুট হয়। তাদের সম্ভাবনা এবং তা বাস্তবায়নের কোনো প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। পিতামাতার ভরণপোষণ আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চয়ই প্রয়োজন। তবে এটাও অন্যের উপর নির্ভরতার ধারার একটি উদ্যোগ। বরং, যেটা প্রয়োজন তা হলো সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গড়ে তোলার সূচনা করা, তাহলে সকল বৃদ্ধরা নিজেদের সঞ্চিত আয়ের উপর নির্ভর করতে পারবেন এবং তাদেরকে পরমুখাপেক্ষী হতে হবে না।

৯. সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন

সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের প্রস্তাব বাংলাদেশের জন্য অভিনব হলেও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের মতো দেশে এরূপ প্রশিক্ষণ চালু আছে। বাংলাদেশের নিকট প্রতিবেশী শান্তিপ্রিয়, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভূটানেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত। এই কর্মসূচি বাংলাদেশের (ক) যুবদের দৈহিক ও মানসিক সুগঠনের জন্য সহায়ক হবে; (খ) সমাজের সংহতি বৃদ্ধি করবে; (গ) সামরিক বাহিনী এবং জনগণের মধ্যকার সম্পর্ককে ঘনিষ্ট করবে; (ঘ) যুবদের মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভাগীদার হওয়ার জন্য সহায়তা করবে; (ঙ) বাংলাদেশের জনগণের ধীমান গুণের সাথে যোদ্ধা গুণের সংযুক্তি ঘটাবে; এবং (চ) বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্জনে সহায়তা করবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুসৃত সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নানান ভিন্নতা রয়েছে। যেসব বিষয়ে এই ভিন্নতা দেখা যায় তারমধ্যে রয়েছে: (ক) প্রশিক্ষণের শুরু এবং শেষের বয়স; (খ) প্রশিক্ষণের সময়কাল; (গ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পরও পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা; (ঘ) নারীদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের প্রযোজ্যতা; (ঙ) প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ; (চ) প্রশিক্ষণের পর 'রিজার্ভিস্ট' হিসেবে থাকার আবশ্যকতা; এবং (ছ) প্রশিক্ষণের সাথে বাধ্যতামূলক সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (*কনস্ক্রিপশান*) সম্পর্ক।

বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ দেখায় যে, বাংলাদেশের জন্য সামরিক প্রশক্ষণের সময়কাল হতে পারে নয় মাস এবং তা শুরু হতে পারে ১৮ বছর বয়সে। এই কর্মসূচির সর্বজনীনতা রক্ষার স্বার্থে দৈহিক এবং মানসিকভাবে উপযুক্তদের অব্যাহতি লাভের সুযোগ যথসম্ভব কম রাখাই ভাল। প্রথমে কেবল পুরুষদের নিয়েই এই কর্মসূচি শুরু করা যেতে পারে, এবং পরবর্তীতে নারীদের জন্য কিছুটা সংশোধিত কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে এবং তাতে যোগদান স্বেচ্ছাভিত্তিক রাখা যেতে পারে। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে পুনরায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং *'রিজার্ভিস্ট'* হিসেবে থাকার আবশ্যকতা নেই বললেই চলে। বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে সামরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির (*কনস্ক্রিপশান*)-এর কোনো বিপরীত সম্পর্ক নেই; বরং এই কর্মসূচি প্রয়োজনে *কনস্ক্রিপশান*কে সুগম করবে।

সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসাব দেখায় যে, এর জন্য বাংলাদেশের বর্তমান মোট বাজেটের ১.৪ শতাংশের প্রয়োজন হবে। এই ব্যয় একদিকে সহনীয় এবং অন্যদিকে দেশের জন্য সর্বাপেক্ষা ভাল বিনিয়োগ হবে। বিপুল জনসংখ্যা এবং অত্যন্ত ঘনবসতির কারণে সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণ ভৌত সক্ষমতার (লজিস্টিকস) দৃষ্টিকোণ থেকে চ্যালেঞ্জের হবে। তবে ক্রমান্বয়ে এই সক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব। সূচনায় এই সক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রশিক্ষণের সময়কাল নয় মাসের পরিবর্তে তিন মাস করা যেতে পারে, যাতে একই সময়ে প্রশিক্ষণ লাভকারীদের সংখ্যা সীমিত রাখা যায়। তাতেও সমস্যা হলে লটারির মাধ্যমে এই সংখ্যা আরও সীমিত করা সম্ভব হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, "ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়!" এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ভৌতিক সক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব।

বিএনপির ইশতেহারে এই কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তবে ঘনিষ্ট বিশ্লেষণ দেখায় যে, প্রতিরক্ষা বিষয়ে সেখানে যেসব নীতির কথা উল্লেখিত হয় তারমধ্যে প্রাসঙ্গিক সবগুলির অনুসরণ সুগম হবে যদি সর্বজনীন সামরিক শিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং, সরকার এ বিষয়ে আগ্রহী হলে এবং উন্মুক্ত গণ-আলোচনার সূচনা করলে তা বাংলাদেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

১০. জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি

বর্তমান বিশ্বায়িত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার কেবল অভ্যন্তরীণ নীতির উপর নির্ভর করে না; বরং তা বহুলাংশে নির্ভর করে বিশ্ব পরিস্থিতি এবং সেই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসৃত বৈদেশিক নীতি উপর। বাংলাদেশের মূল জাতীয় সম্পদ হলো: (ক) জনসম্পদ; (খ) ভূমি, নদনদী ও পানি সম্পদ; (গ) তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ; এবং (ঘ) ভৌগোলিক অবস্থান।

এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য বৈদেশিক নীতির যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সেগুলি হলো: (ক) উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান; (খ) নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি -- সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি শত্রুতা নয়; (গ) স্বচ্ছতা; এবং (ঘ) জনগণকে আস্থায় নেওয়া। প্রথম বৈশিষ্ট্যটির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হবে (১) রপ্তানির সুযোগ অব্যাহত রাখা ও সম্প্রসারণ; (২) বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বজায় রাখা ও সম্প্রসারণ; (৩) উন্নয়নের জন্য যথার্থ অর্থে মূল্যবান বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি প্রাপ্তি।

বিএনপির ইশতেহারে উল্লেখ করা হয় যে, পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হবে "সবার আগে বাংলাদেশ"। আরও যোগ করা হয় যে, "বন্ধু আছে, কিন্তু কোনো প্রভু নেই" – এই নীতির আলোকে "সমতা ও আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে"। ইশতেহারে পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক কর্মসূচির এক দীর্ঘ তালিকা পরিবেশন করা হয়। এতে পররাষ্ট্র নীতির উপর্যুক্ত বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অনেকগুলি প্রতিফলিত হয়।

তবে কথায় আছে, "ফলে বৃক্ষের পরিচয়।" বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি এখন সবচেয়ে বেশি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি, যার আনুষ্ঠানিক নাম BD-US Agreement on Reciprocal Trade (ART)। গত ৯ই ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পর্যবেক্ষকদের মতে এই চুক্তি বাংলাদেশের জন্য প্রতিকূল এবং অসম্মানজনক। যদিও এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বিএনপি সরকার গঠিত হওয়ার এক সপ্তাহ আগে, কিন্তু সরকার এই চুক্তির দায় এড়াতে পারে না কারণ, প্রথমত, যে দুই ব্যক্তি বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে এই চুক্তি নিয়ে দেন-দরবার করেছেন এবং অবশেষে স্বাক্ষর করেছেন তাদের অন্যতম হলেন খলিলুর রহমান, যাকে বিএনপি পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে নিয়োগ দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, যদিও এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ষাট দিনের মধ্যে সংশোধন দাবি করা এবং এমনকি চুক্তি থেকে সরে আসার বিধান রয়েছে, কিন্তু বিএনপি সরকার সে ধরনের কোনো উদ্যোগ এ যাবত নেয় নি এবং নেওয়ার কথা ভাবছে বলেও কোনো ইংগিত দেয় নি। সুতরাং, ধারণা করা যায় যে, এই চুক্তির বিষয়ে নবগঠিত বিএনপি সরকার সম্মত।

সমস্যা হলো যে, এই চুক্তি বিএনপির ইশতেহারে প্রদত্ত বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। স্পষ্টতই, এই চুক্তি বাংলাদেশের জন্য সম্মানজনক নয় এবং এই চুক্তির বহু ধারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সমার্থক। বিএনপির ইশতেহারে উল্লেখিত হয়েছে যে, "গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক শক্তি এবং আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অংশীদার দেশগুলির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার করার জন্য নিরলসভাবে

কাজ করা হবে"। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাথে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি মেনে চলার অর্থ হবে কেবল একটি অংশীদার দেশের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য অংশীদার দেশের বিরূপতার সম্মুখীন হওয়া।

সুতরাং, জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নের স্বার্থে বৈদেশিক নীতির ব্যবহারের লক্ষ্যের প্রেক্ষাপটে নবগঠিত বিএনপি সরকারের এযাবত গৃহীত পদক্ষেপ তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। আগামীতে এক্ষেত্রে বিএনপি কী ধরনের ভূমিকা পালন করে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয়।

জনগণ কী করতে পারে?

এই প্রবন্ধের সূচনায় উত্থাপিত তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল, স্বীয় প্রত্যাশা পূরণে জনগণ কী করতে পারে। নিঃসন্দেহে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে গঠিত বিএনপি সরকারের কাছ থেকে জনগণের প্রত্যাশা ব্যাপক। ভোটারদের প্রায় ৫০ শতাংশ বিএনপির পক্ষে রায় দিয়েছে, যার ফলে বিএনপি সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে। একক শক্তিতে বিএনপি সংবিধানের সংশোধন পাশ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। এরপরও যদি বিএনপি দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ না করতে পারে তবে দোষ চাপানোর মতো অন্য কাউকে খুঁজে পাওয়া বিএনপির জন্য কঠিন হবে।

স্বীয় প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে জনগণের অনেক কিছু করণীয় আছে। প্রথম হলো, কোথায় এবং কীভাবে বিএনপি সরকার প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছে না, তা দ্রুত শনাক্ত করা এবং সে বিষয়ে সোচ্চার হওয়া। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সরকারের বিফল হওয়ার পেছনে যে বিষয়টি বেশী কাজ করে তা হলো সরকারি দলের অর্থায়নে এমনসব গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে যাদের স্বার্থ প্রায়শ জনগণের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তখন তাঁরা নিজেদের স্বার্থানুনোগ নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়। বিগত সরকারের আমলে আমরা তার বহু প্রকাশ্য দৃষ্টান্ত দেখেছি। বর্তমান বিএনপি সরকারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে নিয়োগ, প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাংকিং রেজ্যুলুশান পাশ করা, প্রশ্নবিদ্ধ বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর, ইত্যাদির মধ্যে অনেকে তার দৃষ্টান্ত দেখছেন।

এসব ক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন, তা হলো জনগণকে এসব গণবিরোধী স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক (*কাউন্টারভেইলিং*) শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি দল অনুসৃত ভ্রান্ত এবং গণ-বিরোধী নীতির পরিবর্তে বিকল্প এবং আস্থা উদ্রেককারী বিকল্প নীতি প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা। জনগণের স্বার্থসপক্ষ সামাজিক শক্তিকেই এই প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে হবে। তাতে হয় বিদ্যমান সরকার জনগণের প্রত্যাশার দিকে ফিরে আসবে, অথবা যদি প্রত্যাশার সাথে সরকারের নীতি ও অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য বাড়তেই থাকে তাহলে প্রতিরোধক শক্তি বিকল্পের অনুসন্ধানে ব্যপৃত হবে।

বিএনপি সরকার এখনো নবগঠিত। মাত্র তিন মাস হয়েছে সরকার ক্ষমতায়। সুতরাং, এই সরকারের সামগ্রিক সাফল্য কিংবা বিফলতা বিষয়ে চূড়ান্ত রায়ে পৌঁছানোর সময় সম্ভবত এখনো আসেনি। তবে এই প্রবন্ধের পর্যালোচনা দেখায় যে, কিছু কিছু বিষয়ে আশান্বিত হওয়ার পাশাপাশি অনেক বিষয়ে ইতিমধ্যে আশাভঙ্গ ঘটেছে।

অনেক চড়াই-উৎড়াই পাড় হয়ে বাংলাদেশে পুনরায় একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকুক এটাই জনগণের আশা। তবে সেজন্য প্রয়োজন বিএনপি সরকার কর্তৃক জনগণকে অতিরিক্ত হতাশ না করা, কারণ সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পথে এই নতুন যাত্রাটিই পুনরায় সংকটের সম্মুখীন হতে পারে এবং সেটা বাংলাদেশের জন্য শুভ হবে না।

নির্দেশিত রচনাবলী

Ahmed, Akhter (2024), "Agricultural growth: Key to accelerated poverty reduction in Bangladesh," *The Financial Express*, February 12, (Country Representative, IFPRI-Bangladesh)

Ahsan, Ahmad (2019), Bangladesh's Economic Geography: Some Patterns and Implications," *Journal of Bangladesh Studies,* Vol. 21, Issue 1, pp. 1-17

Ahsan, Ahmad (2021), "Dhaka's Overgrowth and Its Costs," Presentation-Talk to BIDS Annual Conference, December.

Ahsan, A. (2022) "What Budget Discussions Omit – Can Bangladesh Develop Without Decentralizing?", *Policy Insights*, Policy Research Institute Quarterly, September.

Barkat A. and G. Suhrawardy (2019), *Empowering the poor and marginalized through land reform: CSO Land Watch Monitoring Report in Bangladesh 2018.* Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), and Land Watch Asia (LWA)

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) (2023), Statistical Yearbook of Bangladesh 2022. Ministry of Planning, Government of Bangladesh

Bertocci, Peter (1970), *Elusive Villages: Social Structure and Community Organization in Rural East Pakistan*, unpublished Ph.D. Dissertation, Michigan State University

বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল), *সবার আগে বাংলাদেশ*, বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ (ত্রয়োদশ নির্বাচনের জন্য রচিত), https://www.bnpbd.org/manifesto?language=bn

Bunn, Daniel and Cecilia Perez Weigel (2023), "Sources of Government Revenue in the OECD," Tax Foundation, https://taxfoundation.org/oecd-tax-revenue-by-country-2023/

Causa, Orsetta and Mikkel Hermansen (2019), "Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries." Economic Department Working Paper No. 1453, July, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Corrine C. Delechat and Leandro Medina (eds.) (2021), *The Global Informal Workforce: Priorities for Inclusive Growth*, International Monetary Fund, Washington D.C.,

ফরাসউদ্দিন, মোহাম্মদ (২০২৪), *বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আগামীর করণীয়: জাতীয় সপ্তবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার একটি প্রস্তাবিত রূপরেখা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

Gatenby, Victoria (2019), "UNESCO labels Sundarbans of Bangladesh 'World Heritage in Danger'," New/Bangladesh, July 4, available at https://www.aljazeera.com/news/2019/unesco-labels-sundarbans-bangladesh-world-heritage-danger-190704105023538.html.

FI (Global Financial Integrity) (2021), "Trade-related illicit financial flows in 134 developing countries 2009-2018," *Global Financial Integrity, 2021 Report.* See also https://thefinancialexpress.com.bd/trade/4965b-siphoned-off-from-bangladesh-in-six-years-gfi-1639797327।

GoB (Government of Bangladesh) (2020), *8th Five-Year Plan (July 2020—June2025): Promoting Prosperity and Fostering Inclusiveness*, General Economics Division, Bangladesh Planning Commission, Ministry of Planning, Dhaka

IECO (International Engineering Company) (1964a) *Master Plan.* Vol. I. Dhaka: East Pakistan Water and Power Development Board (EPWAPDA).

IECO (International Engineering Company) (1964b) *Master Plan.* Vol. II. Dhaka: East Pakistan Water and Power Development Board (EPWAPDA).

Islam, Mazharul M. (2016), "Demographic transition and the emerging windows of opportunities and challenges in Bangladesh," *Journal of Population Research* 33: 283-305.

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৪), *বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল প্রসঙ্গ*, সমাজ গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৭), *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাঃ বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট ও বিকল্প পথের প্রশ্ন*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা

Islam, Nazrul (2001), "The institutional approach to political stability in Bangladesh," *The Journal of Social Studies*, 93 (July-September), pp. 80-100

ইসলাম, নজরুল (২০১১ক), *বাংলাদেশের গ্রাম: অতীত ও ভবিষ্যত*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০১১খ), "বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব," *প্রতিচিন্তা*, প্রথম সংখ্যা,

ইসলাম, নজরুল (২০১২), *আগামী দিনের বাংলাদেশ*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

Islam, Nazrul S. (2016), *Governance for Development: Political and Administrative Reforms in Bangladesh*, Palgrave-Macmillan, New York

ইসলাম, নজরুল (২০১৭), *বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম*, ঈস্টার্ন একাডেমিক, ঢাকা

Islam, Nazrul S. (2018), *Bangladesh Delta Plan: A Review*, Eastern Academic, Dhaka.

Islam, Nazrul S. (2020), *Rivers and Sustainable Development: Alternative Approaches to Rivers and Their Implications*, Oxford University Press, New York

Islam, Nazrul S. (2022a), *Water Development in Bangladesh: Past, Present, & Future*, Eastern Academic, Dhaka

Islam, Nazrul S. (2022b), *A Review of Bangladesh Delta Plan 2100*, Eastern Academic, Dhaka

Islam, Nazrul S. (2022c), *Looking at the Past to See the Future*, BIDS public lecture, Bangladesh Institute for Development Studies, Dhaka, Bangladesh

Islam, Nazrul S. (2023), *Our Debt to the Four Professors*, প্রথমা প্রকাশন, Dhaka

ইসলাম, নজরুল (২০২৩), *বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন: বর্তমান ধারার সংকট এবং বিকল্পের প্রস্তাব*, প্রাচ্য প্রজ্ঞা, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০২৪ক), *আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়*, গণ-বক্তৃতা নিউ সিরিজ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০২৪খ), *রাষ্ট্র সংস্কার এবং সংবিধান সংশোধন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০২৪গ), *আনুপাতিক নির্বাচন – কী এবং কেন?* বাংলাধরিত্রী, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০২৪ঘ), বৈষম্য হ্রাসে প্রয়োজন আনুপাতিক নির্বাচন, *দৈনিক সমকাল*, আগস্ট ১১, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৪ঙ), "সংসদকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পূর্বশর্ত আনুপাতিক নির্বাচন, *প্রথম আলো*," নভেম্বর ৬, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৪চ), "আনুপাতিক নির্বাচন নিয়ে যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা প্রয়োজন," *প্রথম আলো*, নভেম্বর ২০, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৫ক), আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয়, বাংলাধরিত্রী, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০২৫খ), *উন্নয়নের জন্য সুশাসন – বাংলাদেশে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সংস্কার*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (২০২৫গ), *বাংলাদেশের রাজনীতি – সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, দ্যু প্রকাশন, ঢাকা

ইসলাম, নজরুল (সম্পাদক) (২০২৫ঘ), *সংকটে তিস্তা নদী – সমাধান কোন পথে*, বাপা এবং বেন, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০১৫ঙ), "বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনায় চীনা সহায়তার ভালমন্দ," *প্রথম আলো*, ৮ এপ্রিল, ২০২৫

ইসলাম, নজরুল (২০২৫চ), "কোন পথে সংস্কার ও রাজনৈতিক ঐকমত্য," *প্রথম আলো*, মে ২১, ঢাকা।

ইসলাম, নজরুল (২০২৫ছ), "আবারও কি সংস্কারের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে," ২ জুলাই, *প্রথম আলো*, ঢাকা।

Islam, Sirajul (1979), *The Permanent Settlement in Bengal: A Study of Its Operation 1790-1819*, Bangla Academy, Dhaka

Jahan, Rounaq and Inge Amundsen (2010), *The Parliament of Bangladesh: Representation and Accountability*, CPD-CMI Working Paper Series No. 2, Centre for Policy Dialogue and Chr. Michelsen Institute

Krug, J. A., W. J. van Blommestein, Anthony R. Thomas, Fred C. Shorter, James Shaw, Charles W. Okey (1957), *Water and Power Development in East Pakistan*, Report of a UN Technical Assistance Mission, New York, June

Lewis, Arthur (1954) "Economic development with unlimited supplies of labour," *The Manchester School*, Vol. 22, pp. 139-191

Mahmood, Syed A. (2022), Economic zones: We must emphasize quality and not quantity, *The Business Standard*, January 9,

Rahman, Fazrul Md. (2022) "Remittance outflow crosses $100m -- thru legal channel," *The Daily Star*, December 26

Rahman, Mustafizur (2026), Is the US-Bangladesh Trade Deal the Best We Can Do? *Counterpoint*, April 19, https://counterpointbd.com/is-the-us-bangladesh-trade-deal-the-best-we-can-do

রায়হান, সেলিম (২০২৬ক), "স্বস্তির চুক্তি, নাকি ভবিষ্যতের বোঝা: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সমঝোতার অর্থনীতি," *প্রথম আলো*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ঢাকা

রায়হান, সেলিম (২০২৬খ), ফ্যামিলি কার্ড; নকশাগত দুর্বলতা কাটানোর পরীক্ষা, প্রথম আলো, ১০ মার্চ, ঢাকা

রায়, রাজা দেবাশীষ (২০০৪), *পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ও ভূমির অধিকার*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (ICIMD), কাঠমন্ডু, নেপাল

Rawls, John (1971), Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Rehman Sobhan*, Basic Democracies Works Programme and Rural Development in East Pakistan*, Bureau of Economic Research, University of Dhaka, Dhaka 1968

Sen, Amartya (1990), "More Than 100 Million Women Are Missing," *New York Review of Books*, 37 (December 20).

Sen, B., Ahmed, M., Ali, Z., & Yunus, M. (2014). Regional Inequality in Bangladesh in the 2000s: Revisiting the East-West Divide debate. BIDS-REF Study Series No. 14-01 Dhaka: Bangladesh Institute of Development Studies.

Sobhan, Rehman (1968), *Basic Democracies, Works Progammes, and Rural Development in East Pakistan*, Bureau of Economic Research, Dhaka University.

Sobhan, Rehman (2021), *Untranquil Recollections: Nation Building in Post-Liberation Bangladesh*, New Delhi: Sage Publications

United Nations (1997), *Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses*, General Assembly Resolution 51/229, annex, Official Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 49 (A/51/49)

United Nations (2021), *Reconsidering Rural Development*, World Social Report 2021, Department of Economic and Social Affairs, ST/ESA/376

Zohir, S. (2011). Regional Differences in Poverty Levels and Trends in Bangladesh: Are we asking the right questions? Dhaka: Economic Research Group.

WID (World Inequality Database) (2023), www.wid.world (A Source for Global Inequality Data, 2024